Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশিপ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

অনুভা আক্তার খাদিজা

রোলঃ 228021478

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশিপ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

অনুভা আক্তার খাদিজা

রোলঃ 228021478

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশিপ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে অনুভা আক্তার খাদিজা, আইডিঃ 228021478 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশিপ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

অনুভা আক্তার খাদিজা

আইডিঃ 228021478

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ : ভূমিকা 5

অধ্যায় ২ : হারাম এর আলোচনা 7

অধ্যায় ৩ : হারাম সম্পর্কের সংজ্ঞা ও ধরন 12

অধ্যায় ৪: ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশিপ 21

অধ্যায় ৫ : কুরআনের আলোকে হারাম রিলেশনশিপ 23

অধ্যায় ৬ : হাদীসের আলোকে হারাম রিলেশনশিপ 46

অধ্যায় ৭ : সমাজে হারাম সম্পর্ক ছড়িয়ে পড়ার কারণসমূহ 49

অধ্যায় ৮ : হারাম সম্পর্কের পারিবারিক ও সামাজিক পরিণতি 49

অধ্যায় ৯ : ইসলামে হারাম সম্পর্কের বিধান: কারণ ও উদ্দেশ্য 51

অধ্যায় ১০ : হারাম সম্পর্ক থেকে বাঁচার উপায় ও ইসলামের দিকনির্দেশনা 52

অধ্যায় ১১: হারাম সম্পর্কের শাস্তি এবং ইসলামী বিচার ব্যবস্থা 56

অধ্যায় ১২ : উপসংহার ও সারসংক্ষেপ 61

তথ্যসূত্র 62

অধ্যায় ১ : ভূমিকা

১.১ গবেষণার পটভূমি

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজকর্মের যথাযথ দিকনির্দেশনা ইসলামে বিদ্যমান। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয় ও দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি কাজ শ্রেষ্ঠ পন্থায় সম্পাদনের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ রয়েছে ইসলামে। এজন্য ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা বলা হয়।

মানবজীবনে সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যার সাথে জড়িয়ে আছে মানব অস্তিত্ব। তাই পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সম্পর্ক কিভাবে হবে, তার সীমা-পরিসীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছে ইসলাম। সম্পর্ক ইসলামের নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকলে হয় কল্যাণকর, আর যদি সীমালঙ্ঘন করে, তবে হয় ধ্বংসের কারণ। ব্যক্তিগত পবিত্রতা ও সামাজিক সুস্থতাকে ধ্বংস করে কিছু ধ্বংসাত্মক সম্পর্ক; আর এই ধরনের ধ্বংসাত্মক সম্পর্ককেই ইসলামে কঠিনভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বর্তমানে আধুনিক বিশ্বে মূল্যবোধ ক্ষয়িষ্ণু এবং অশ্লীলতার স্রোত অপ্রতিরোধ্য হওয়ায় "ভালোবাসা" বা "প্রেম" নামক সম্পর্কগুলো ইসলামী সীমারেখা অতিক্রম করে ধ্বংসাত্মক হারাম বা নিষিদ্ধ সম্পর্কে রূপ নিচ্ছে।

এ গবেষণাপত্রে আমরা হারাম সম্পর্কের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর পরিণতি এবং করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

- ❖ ইসলামে সম্পর্কের বৈধ ও অবৈধ সীমা নির্ধারণ।
- ❖ ইসলামে হারাম সম্পর্কের সংজ্ঞা, ধরন ও প্রকৃতি নির্ধারণ।
- ❖ হারাম সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামী অবস্থান পরিষ্কার করা
- ❖ কুরআন ও হাদীসের আলোকে হারাম সম্পর্ক বিষয়ের ক্ষতিকর দিকগুলো ব্যাখা বিশ্লেষণের সাথে তুলে ধরা।
- ❖ হারাম সম্পর্কের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষতি ও প্রভাব তুলে ধরা।
- ❖ ইসলামী নির্দেশনা অনুযায়ী ও বর্তমান প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে এর প্রতিকার, প্রতিরোধ , সমধান ও পরিত্রাণের পথ উপস্থাপন করা।
- ❖ সমাজের নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধে করা।

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, মিডিয়া ও পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে হারাম সম্পর্ক বর্তমানে এক ভয়াবহ সামাজিক ও মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। যে ব্যাধি এখন ছড়িয়ে পড়ছে শিশু-

কিশোর থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত। যা শুধু ব্যাক্তিগত সমস্যা বা ব্যাধি ই থেকে যায় নি এই ব্যাধি হয়ে উঠেছে পরিবার ,সমাজ, রাষ্ট্র ও গোটা বিশ্বের ভয়ঙ্কর ব্যাধি।

জাহিলিয়াতের অন্ধকারে কেমন যেনো গোটা সমাজ ও বিশ্ব নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায় প্রতিনিয়ত জর্জরিত হতে হচ্ছে গোটা সমাজকে। কোথায় ও যেনো শান্তির দেখা নেই। যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে এই যেনো অশ্লীলতা আর নৈতিক অবক্ষয়ের দেখা মিলছে। যার ফলে নৈতিকতা নষ্ট হচ্ছে,পারিবারিক সম্পর্কে ধরছে ভাঙন ও পারিবারিক বন্ধনগুলো হয়ে যাচ্ছে দূর্বল। সমাজ হচ্ছে অসুস্থ মানুষে মানুষের মধ্যে বাড়ছে কোলহ ,বিশৃঙ্খলা ,দ্বন্দ্ব, অবৈধ সন্তান এর সংখ্যা। সব কিছু হয়ে উঠছে দিনকে দিন আরো বিষাক্ত আরো ধ্বংসাত্মক আরো জটিল।

আল্লাহর ক্রোধ ও গজব নাজিল হচ্ছে।

যা গোটা সমাজের জন্য একপ্রকার মহামারীর আকার ধারণ করেছে। এই মহামারী ও ভয়াবহ ব্যাধি থেকে আমাদের ভাই বোনদের ও গোটা সমাজকে রক্ষা করার জন্য ইসলামের আলোকে হারাম সম্পর্কের প্রকৃতি, হারাম সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামী অবস্থান পরিষ্কার করা, কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা এবং সমাধানের উপায় নির্দেশ করা এখন বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমাজের প্রতিনিয়ত এই নৈতিক অবক্ষয়কে প্রতিরোধের জন্য কুরআন-হাদীসভিত্তিক গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১.৪ গবেষণার সীমা ও সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণা মূলত "ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম রিলেশনশিপ" নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। এটি একটি তাত্ত্বিক (theoretical) গবেষণা; প্রাকটিক্যাল বা পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণা নয়। সময়, তথ্যপ্রাপ্তি ও গবেষণার সুযোগ সীমিত হওয়ায় এটি সব দিক সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরতে সক্ষম নাও হতে পারে।

১.৫ গবেষণার পদ্ধতি

- প্রথম উৎস: কুরআন মাজীদ, সহীহ হাদীস।
- দ্বিতীয় উৎস: তাফসীর, ফিকহগ্রন্থ, ইসলামিক স্কলারদের বক্তব্য।
- তুলনামূলক বিশ্লেষণ : সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা ও ইসলামী আদর্শের তুলনা।

অধ্যায় ২ : হারাম এর আলোচনা

২.১ হারাম এর সংজ্ঞা ও বর্ননা

হারাম (আরবি : حَرَام) একটি ইসলামি পরিভাষা । যার বাংলা অর্থ নিষিদ্ধ , অবৈধ ।
পারিভাষিক সংজ্ঞা: যেসব কাজ বা বস্তু কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশে অবশ্য পরিত্যাজ্য, বর্জনীয় তাকে হারাম বলে।
ইসলামে এই হারাম অর্থ দ্বারা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ কাজ বোঝানো হয়। মন্দ কাজসমূহের মধ্যে হারামকে সবচেয়ে গুরুতর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদি কোনো কাজ হারামের মধ্যে পড়ে তবে তা যেকোনো ভালো উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেনো তা নিষিদ্ধ ই থেকে যাবে এবং সেই কাজকে পরিত্যাগ ও বর্জন করতে হবে। যিনি আল্লাহ, রাসুল ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে অর্থ্যাৎ একজন মুসলিম যদি হারাম বা বর্জনীয় কাজ করে তাহলে কবিরা গুনাহ হয়। কবিরা গুনাহ বা বড় গুনাহ হচ্ছে এমন গুনাহ যা জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কবিরা গুনাহ তওবা ছাড়া ক্ষমা করেন না।
হারাম হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা
এই ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাল্লাহু ওয়া তায়ালা কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেছেন ,
تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾
এইসব আল্লাহ্ র নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ্ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটা মহাসাফল্য।
(সুরা আন-নিসা: ১৩) [১]
وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَـٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾
অর্থ: পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর (স্থিরীকৃত) সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জাহান্নামে, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং তার জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।
(সুরা আন-নিসা: ১৪) [২]

* বর্তমানে মানুষের কাছে "হারাম" বিষয়টি স্পষ্ট না। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশিপ বিষয়টি আলোচনার পূর্বে হারাম বিষয়ের আলোচনা স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা অতি প্রয়োজনীয়।

২.২ হারাম হওয়ার কারণসমূহ

১. আল্লাহর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা (কুরআনের আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ)

২. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্পষ্টভাবে বারণ (হাদিস দ্বারা নিষিদ্ধ)

৩. উম্মাহর সর্বসম্মত (ইজমা) ফতওয়া বা সিদ্ধান্ত

৪. অপকার বা ক্ষতিকর প্রভাব (যেমন: প্রাণহানি, চরিত্রহানি, সমাজ নষ্ট ইত্যাদি)

২.৩ কেনো আল্লাহ্ﷻ কোনো কিছুকে হারাম করেছেন?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কোনো কিছুকে হারাম করেছেন নিছক মানুষের ওপর কঠোরতা আরোপ করার জন্য নয় বরং এর পেছনে রয়েছে অসীম গভীর হিকমাহ,প্রজ্ঞা এবং পরম করুণাময় অসীম দয়ালু তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ভালোবেসে, কল্যাণের জন্য, ও হিফাযতের জন্যই কিছু বস্তু কিছু কাজ থেকে তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

কুরআনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এরশাদ করেছেন:

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

অর্থ: যারা এই রাসূলের অর্থাৎ উম্মী নবীর অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাওরাত ও ইনজীলে, যা তাদের নিকট আছে, লিপিবদ্ধ পাবে, যে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে এবং

তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করবে ও নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করবে এবং তাদের থেকে ভার ও গলার বেড়ি নামাবে, যা তাদের উপর চাপানো ছিল। সুতরাং যারা তার (অর্থাৎ নবীর) প্রতি ঈমান আনবে, তাকে সম্মান করবে, তার সাহায্য করবে এবং তার সঙ্গে যে নূর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করবে, তারাই হবে সফলকাম।

(সুরা আল-আ'রাফ: ১৫৭) [৩]

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা য়ায় আমাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উৎকৃষ্ট ও উত্তম বস্তুকেই কেবল হালাল করেছেন এবং **আমাদের জন্য নিকৃষ্ট ও অনুত্তম বস্তুকে করেছেন হারাম**।

তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা , তাই তিনি ই জানেন আমাদের জন্য কোনটা কল্যাণকর এবং কোনটা অকল্যাণকর ; কোনটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর কোনটা আমাদের জন্য উপকারী।

তিনি আমাদের কে আমাদের নিজেদের চেয়ে ও ভালোভাবে চিনেন, জানেন।

তিনি যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাতে ই আমরা পাই কল্যান। শুধু যে এই জীবনে ই কল্যান তা ই কিন্তু নয় বরং মৃত্যুর পরের জীবনের পুরুষ্কারের প্রতিশ্রুতি ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের কে দিয়েছেন।

২.৪ হারামের পরিনতি

হারামের পরিণতি ইসলামের দৃষ্টিতে অনেক গুরুতর বিষয়, যা কুরআন, হাদীস ও ইসলামী আইন (ফিকাহ) অনুযায়ী মানুষকে সর্তক থাকতে এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। হারাম কাজের পরিণতি শুধু দুনিয়ার ক্ষেত্রে নয়, বরং আখিরাতের জন্যও মারাত্মক হতে পারে। নিচে হারামের পরিণতির বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করা হলো:

১. আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গুনাহের বোঝা:
হারাম কাজ করলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জিত হয়, এবং মানুষের উপর গুনাহের বোঝা চাপিয়ে দেয়।

আল্লাহ্ ﷻবলেন:
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾
আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।
(সূরা আল-আহযাব:৩৬) [৪]

২. আন্তরিক শান্তি এবং হেদায়েতের অভাব:
হারাম কাজ মানুষের অন্তরে শান্তি ও সুখের অভাব সৃষ্টি করে। এতে মানুষের ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার মাঝে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।
এছাড়া হাদিসে এসেছে:
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ (كلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) ." قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরের মধ্যে একটি কালো চিহ্ন পড়ে। অতঃপর যখন সে গুনাহর কাজ পরিহার করে,

ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাওবা করে তার অন্তর তখন পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়। সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার পুরো অন্তর এভাবে কালো দাগে ঢেকে যায়। এটাই সেই মরিচা আল্লাহ তা'আলা যার বর্ণনা করেছেনঃ "কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনে জং (মরিচা) ধরিয়েছে" – (সূরা মুত্বাফফিফীন ১৪)।
(জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩৩৩৪) [৫]

এটি ঈমানের অন্ধকার এবং আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৩. সমাজে নেতিবাচক প্রভাব:
হারাম কাজ সমাজে অস্থিরতা, অপরাধ এবং দুর্নীতি বাড়িয়ে তোলে। যখন একে একে মানুষ হারাম কাজ করে, তখন পুরো সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ঘটে এবং এটি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৪. অস্থিরতা ও বিপর্যয়ের আশঙ্কা
হারাম কাজ এক ব্যক্তির জীবনে অস্থিরতা, চিন্তার জটিলতা, শারীরিক অস্বস্তি এবং মানসিক অবসাদ সৃষ্টি করতে পারে। এতে মানুষের মনের শান্তি ও সুখ নষ্ট হয়ে যায়।

উপসংহার: হারামের পরিণতি শুধু আধ্যাত্মিক নয়, তা দুনিয়া এবং আখিরাতে একাধিক শাস্তি ও বিপদ নিয়ে আসে। ইসলামের দৃষ্টিতে, হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা এবং তওবা করা একমাত্র মুক্তির পথ। ইসলামে পুণ্য অর্জন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হারাম কাজ থেকে দূরে থাকা অত্যন্ত জরুরি।

২.৫ হারাম কে হালাল মনে করা

হারামকে হালাল মনে করা একটি গুরুতর গুনাহ এবং ইসলামের মৌলিক বিধানের বিরুদ্ধে চলে। ইসলামে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সা.) যা হারাম ঘোষণা করেছেন, তা কখনোই হালাল হতে পারে না। যারা হারাম কাজকে হালাল মনে করে, তারা আল্লাহর বিধান ও শরিয়তের সাথে বিরোধিতা করছে। এর পরিণতি কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করা
হারাম কাজকে হালাল মনে করা কুফরের কাজ।
যে ব্যক্তি হারাম কাজকে হালাল মনে করে, সে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করছে, যা একটি মারাত্মক অপরাধ।
আল্লাহ্ ﷻকুরআনে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

হে মুমিনগণ, আল্লাহ যে সব পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তোমরা তা হারাম করো না এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।
(সূরা আল মায়িদা : ৮৭) [৬]

এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় যে, হারাম বিষয়ের সাথে কোন আপস করা বা তা হালাল মনে করা ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী।
আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হালাল-হারামকে পরিবর্তন করতে চায়, সে আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস দেখায়, যা কুফর হিসেবে গণ্য হতে পারে।

২. শিরক ও গুনাহ
শির্ক দু'প্রকার (১) বড় শির্ক। (২) ছোট শির্ক।
বড় শির্ক দ্বীন থেকে খারেজ করে দেয়, সমস্ত আমল পন্ড করে দেয় এবং তওবা ছাড়া মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বানায়।
হারাম কাজকে হালাল মনে করা শিরকের দিকে নিয়ে যায় , কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহর আইনকে অগ্রাহ্য করা হয়। আর এটি বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৩. বিধানের প্রতি অবিশ্বাস
যে ব্যক্তি হারাম কে হালাল মনে করে, সে মূলত ইসলামি আইন ও শাস্তির প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করছে। এটি ইসলামি শরিয়তের মৌলিক অঙ্গকে খণ্ডিত করার সমতুল্য।

৪.প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা

এ ধরনের মনোভাব মুসলিম সমাজে বিপদ সৃষ্টি করে, কারণ এটি সমাজের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। যখন মানুষ নিজেদের ইচ্ছেমতো আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করতে শুরু করে, তখন সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

উপসংহার:

হারাম কাজকে হালাল মনে করা একটি মারাত্মক অপরাধ এবং ইসলামের মৌলিক বিধানের প্রতি অবজ্ঞা। এটি কুফর, শিরক ও গভীর গুনাহের দিকে পরিচালিত করতে পারে। সুতরাং, একজন মুসলিমের উচিত, সে কোন ধরনের কাজের হালাল-হারাম বিধি জানুক, তা পালন করা এবং আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অবিচল থাকা।

অধ্যায় ৩ : হারাম সম্পর্কের সংজ্ঞা ও ধরন

৩.১ হারাম সম্পর্কের সংজ্ঞা

হারাম সম্পর্ক বলতে নারী ও পুরুষের মাঝে বিবাহবহির্ভূত শারীরিক, মানসিক , আবেগিক বা গোপনীয় সম্পর্ককে বোঝায় যা কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী ফিক্বহ দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। এ ধরনের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য:

- আল্লাহ ও রাসূল ﷺ কর্তৃক নিষিদ্ধ।
- শরীয়াহর সীমা লঙ্ঘনকারী।
- ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের ধ্বংসের কারন।

৩.২ ইসলামে সম্পর্কের মূলনীতি

ইসলামে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় তিনটি ভিত্তিতে:

- ❖ মাহরাম সম্পর্ক: যাদের সাথে বিয়ে হারাম।
- ❖ বিবাহিত সম্পর্ক: যা হালাল ও বৈধ।
- ❖ অপরিচিত, গায়রে মাহরাম, নন – মাহরাম সম্পর্ক: যা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত।

এই মূলনীতির বাইরে বিবাহবহির্ভূত যে শারীরিক ও মানসিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গুলো গড়ে ওঠে তা ই মূলত ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশিপ।

৩.৩ কুরআন ও হাদীসের আলোকে সমাজে প্রচলিত হারাম সম্পর্কের বিশ্লেষণ

বর্তমানে আধুনিক সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে। হারাম সম্পর্কগুলো নতুন নাম ও যুক্তির আবরণে স্বাভাবিক, ব্যক্তিগত পছন্দ, মানবিক অধিকার, পাপমুক্ত ও পবিত্র সম্পর্ক হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। অথচ ইসলামী দৃষ্টিতে এসব সম্পর্ক চরম গুনাহের, যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এই অধ্যায়ে এসব সম্পর্কের ইসলামী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হবে।

৩.৩.১ বিবাহ ছাড়া অবৈধ সম্পর্ক

সংজ্ঞা: বিবাহ ছাড়া নারী-পুরুষের অনলাইন বা সরাসরি আবেগিক, বন্ধুত্বপূর্ণ,ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক,প্রেম,দেখা-সাক্ষাৎ, বার্তা আদান-প্রদান, শারীরিক সম্পর্ক ।

সমাজে বিবাহ ছাড়া অবৈধ সম্পর্কের প্রচলিত রূপ:

- ❖ (পবিত্র প্রেম/ভালোবাসা) আবেগভিত্তিক সম্পর্ক – প্রেম বা ভালোবাসার নামে আবেগে গড়ে ওঠা ঘনিষ্ঠতা।
- ❖ শারীরিক সম্পর্ক – দৈহিক স্পর্শ বা মিলন ।
- ❖ (চ্যাটিং ফ্রেন্ডস,গেইমিং পার্টনার) ভার্চুয়াল সম্পর্ক – সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠা আবেগিক ও অশালীন সম্পর্ক।
- ❖ (বন্ধুত্ব) জাস্ট ফ্রেন্ডের সম্পর্ক — বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে এমন বন্ধুত্ব যেখানে প্রেম নেই বলা হয়, কিন্তু তা ধীরে ধীরে আবেগিক ও শারীরিক সম্পর্কে রূপ নেয়।
- ❖ (লাভ রিলেশনশিপ) বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড সম্পর্ক – নারী পুরুষের আবেগিক ও শারীরিক সম্পর্ক।
- ❖ ডেটিং কালচার – বিয়ে ছাড়াই ছেলে-মেয়ের একসাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ সময় কাটানো।
- ❖ (হালাল প্রেম)ভবিষ্যতে বিয়ে করার অজুহাতে সম্পর্ক – বিয়ে না করে আগেই সম্পর্ক শুরু করা।
- ❖ সপ্তাহ/মাস ভিত্তিক প্রেমের সম্পর্ক– সাময়িক ও ভোগবাদী সম্পর্ক যা পরে ভেঙে যায়।
- ❖ লিভ ইন রিলেশনশিপ – নারী ও পুরুষ বিয়ে না করে একই সঙ্গে একই ছাদের নিচে বেআইনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস ও জীবনযাপন করে যেখানে বিবাহবহির্ভূত মানসিক, শারিরীক,আবেগিক ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান থাকে।

হারাম সম্পর্কের এই সব নাম সমাজে এই উদ্দেশ্যেই চালু হয়েছে যেন সম্পর্কগুলোকে পাপমুক্ত, আধুনিক বা গ্রহণযোগ্য হিসেবে দেখানো যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ ছাড়া অবৈধ সম্পর্ক : অবৈধ যৌন সম্পর্ককে (ব্যভিচার) আরবি তে (যিনা) زِنَىٰ বলা হয়।

এই সম্পর্কে আল্লাহ্ ﷻ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"আর ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীলতা এবং নিকৃষ্ট পথ।"

(সুরা আল-ইসরা: ৩২) [৭]

এই আয়াতে "ধারে-কাছেও যেও না" বলে বোঝানো হয়েছে—যিনা তো হারাম, এমনকি তার দিকে যাওয়ার সব মাধ্যমও হারাম। অর্থাৎ, প্রেম, নির্জনতা, বার্তা আদান-প্রদান, দেখা-সাক্ষাৎ—সবই নিষিদ্ধ।

এই ব্যাপারে হাদীস:

.فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ

"চোখ যিনা করে, হাত যিনা করে, পা যিনা করে, জিহ্বা যিনা করে এবং এরপর যৌনাঙ্গ তা বাস্তবায়ন করে।"

(সহীহ বুখারী:৬২৪৩) [৮]

এই হাদীস দেখায়, যিনা কেবল শারীরিক মিলন নয়—চোখ, কান, কথা, স্পর্শ ইত্যাদি মাধ্যমেও যিনা হয়। প্রেম, মেসেজ, কল, দেখা-সাক্ষাৎ—সবই যিনার দিকে ধাবিত করে।

৩.৩.২ সমকামিতা সম্পর্ক

সংজ্ঞা: একই লিঙ্গের (পুরুষ-পুরুষ বা নারী-নারী) মধ্যে আবেগিক বা শারীরিক সম্পর্ক।
সমাজে সমকামিতা সম্পর্কের প্রচলিত রূপ:

- ❖ গে (Gay) সম্পর্ক: দুই পুরুষের মধ্যে আবেগিক বা শারীরিক সম্পর্ক।
- ❖ লেসবিয়ান (Lesbian) সম্পর্ক: দুই নারীর মধ্যে আবেগিক বা শারীরিক সম্পর্ক।
- ❖ বাইসেক্সুয়াল (B সম্পর্ক: একজন ব্যক্তি উভয় লিঙ্গের (পুরুষ ও নারী) প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সম্পর্ক গড়ে তোলে।
- ❖ ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামী সম্পর্ক: লিঙ্গ পরিবর্তনের পর বিপরীত লিঙ্গ সত্ত্বেও সমকামী প্রবণতায় সম্পর্ক স্থাপন।
- ❖ সেম-সেক্স ম্যারেজ (Same-sex marriage): দুই সমলিঙ্গের ব্যক্তি সমাজ বা আইনের দৃষ্টিতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।
- ❖ অনলাইন/ভার্চুয়াল সমকামী সম্পর্ক: সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একই লিঙ্গের সঙ্গে অবৈধ,অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

ইসলামের দৃষ্টিতে সমকামিতা সম্পর্ক:

এই সম্পর্কে আল্লাহ্ﷻ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন:

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٦٥﴾
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

“মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষদের সাথেই কুকর্ম কর
আর তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক। বরং তোমরা তো এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

(সূরা আশ-শু’আরাঃ ১৬৫-১৬৬) [৯]

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

“এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি ?
তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।

(সূরা আল-আ’রাফ: ৮০-৮১) [১০]

ব্যাখ্যা: এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ কওমে লূতের (আ.) সমকামিতাকে অশ্লীলতা ও সীমালঙ্ঘন হিসেবে অভিহিত করেছেন। পরে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়।

এই ব্যাপারে হাদীস:

রাসূলুল্লাহﷺ বলেন: “যে মানুষ লূত সম্প্রদায়ের কুকর্ম করে সে অভিশপ্ত”।”

(জামে’ আত-তিরমিজি: ১৪৫৬) [১১]

বিশ্লেষণ: সমাজে এসব সম্পর্ক “ভিন্ন যৌনতা”, “স্বাধীন ভালোবাসা”, বা “আধুনিক মানবাধিকার” নামে পরিচিত হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে তা স্পষ্টভাবে হারাম, প্রকৃতি বিরুদ্ধ, ও নৈতিকভাবে ধ্বংসাত্মক। কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী এগুলো আল্লাহর গজব আনার অন্যতম কারণ।

৩.৩.৩ পরকীয়া সম্পর্ক

সংজ্ঞা: বিবাহিত ব্যাক্তি তার বৈধ সঙ্গী ছাড়া বিবাহ বহির্ভূত অন্য কারো সঙ্গে অবৈধভাবে যে আবেগের ও শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

ইসলামের দৃষ্টিতে পরকীয়ার সম্পর্ক:

এই সম্পর্কে আল্লাহ্ﷻ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴿٥﴾
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴿٦﴾

এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।

তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। (সূরা আল-মু'মিনূন: ৫-৬) [১২]

এই আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী, বৈধ বিবাহ ছাড়া কারো সঙ্গে প্রেম বা যৌন সম্পর্ক "অশ্লীলতা" এবং "নিন্দনীয় অপরাধ"। সাথে আল্লাহ ঈমানদারদের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন—তারা তাদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। অর্থাৎ, তারা ব্যভিচার, পরকীয়া বা হারাম সম্পর্ক থেকে নিজেদের রক্ষা করে।

বিশ্লেষণ: পরকীয়া সম্পর্ক পরিবার, সমাজ ও নৈতিকতার জন্য মারাত্মক হুমকি। এটি বিশ্বাসঘাতকতা, পারিবারিক ভাঙন এবং সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ। ইসলাম এই অপরাধকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং কঠিন শাস্তির বিধান রেখেছে।

৩.৩.৪ আন্তধর্মীয় সম্পর্ক

সংজ্ঞা: একজন মুসলিম নারী বা পুরুষের কোনো অমুসলিম (কাফের/মুশরিক) ব্যক্তির সঙ্গে প্রেম বা বিবাহের চেষ্টা।

সমাজে আন্তধর্মীয় সম্পর্কের প্রচলিত রূপ:

- ❖ আন্তধর্মীয় প্রেম (Interfaith Love) – ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছেলে-মেয়ের মধ্যে আবেগিক ও শারীরিক সম্পর্ক। যা লাভ জিহাদ ও ভাগওয়া লাভ নামে ও পরিচিত।
- ❖ আন্তধর্মীয় বিবাহ (Interfaith Marriage) – এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করলে।
- ❖ মিশ্র বিয়ে (Mixed Marriage) – মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে বিয়ে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে:

এই সম্পর্কে আল্লাহ্ﷻ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন:

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিয়ে করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরেক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে। এবং তোমরা (নারীরা) কোন মুশরেকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরেকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা দোযখের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ

নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।
(সুরা আল-বাক্কারাহ:২২১) [১৩]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, **তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফেরদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্যে হালাল নয়।** কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের অপরাধ হবে না। **তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না।** তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।
(সুরা আল-মুমতাহিনা:১০) [১৪]

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, একজন মুসলিম পুরুষ ও নারী কেউই মুশরিক (অমুসলিম) কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এটি ইসলামে বিশ্বাসের শুদ্ধতা ও পারিবারিক কাঠামোর সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। এই নিষেধাজ্ঞা প্রেম বা আন্তধর্মীয় সম্পর্কের দ্বার বন্ধ করে দেয়, যাতে মুসলিম সমাজে ঈমান ও আদর্শ বজায় থাকে।
যেখানে মুসলিম নারীর জন্য অমুসলিম পুরুষের সঙ্গে বিবাহ ই সম্পূর্ণ হারাম। সেখানে মুসলিম নারীর জন্য অমুসলিম পুরুষের সাথে আবেগিক বা শারীরিক সম্পর্ক যে হারাম তা আর বলার অপেক্ষা ই রাখেনা।
ইসলামে বিবাহ ছাড়া কোনো ধরনের আবেগিক বা শারীরিক সম্পর্ক বৈধ নয়, সে মুসলিমের সঙ্গেই হোক বা অমুসলিমের সঙ্গে।
আন্তধর্মীয় সম্পর্ক ইসলামের বিধানের বাইরে গেলে তা স্পষ্টভাবে হারাম। এই সম্পর্ক থেকে বিশ্বাস, পরিবার, সন্তানদের ভবিষ্যত ও আখিরাত সবই ক্ষতির মুখে পড়ে।

৩.৩.৭ রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক (Incest)

সংজ্ঞা: মাহরামদের (যাদের সঙ্গে বিয়ে চিরতরে হারাম) পুরুষ বা নারীর সঙ্গে শারীরিক বা যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা—ইসলামে এটি চরম জঘন্য গোনাহ এবং "যিনা"-এর সবচেয়ে ঘৃণিত রূপ।

ইসলামের দৃষ্টিতে:

আল্লাহ্ﷻ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন:

وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকণ্যা; ভগিনীকণ্যা তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকরী, দয়ালু।

(সূরা আন-নিসা : ২৩) [১৫]

এ আয়াতে মাহরামদের তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সাথে বিয়ে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিধি লঙ্ঘন করে সম্পর্ক স্থাপন করা গুরুতর হারাম ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বিশ্লেষণ: এটি শুধু ধর্মীয়ভাবে নয়, মানবীয় বিবেকেও ঘৃণিত।এর ফলে পারিবারিক কাঠামো ভেঙে পড়ে, সমাজে অস্থিরতা ও অশ্লীলতা বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় ধর্ষণ বা শিশুনির্যাতনের ঘটনাও এর মধ্যে পড়ে, যা আইন ও শরীয়াহ উভয়ের দৃষ্টিতে অপরাধ।

৩.৩.৮ অস্থায়ী দাম্পত্য সম্পর্ক (মুতআ বিবাহ)

মুতাহ বিবাহ এর সম্পর্ককে সাধারণত “অস্থায়ী বিবাহ” বা “অস্থায়ী দাম্পত্য সম্পর্ক” বলা হয়।

এটি এমন একটি সম্পর্ক যা সীমিত সময়ের জন্য স্থাপন করা হয় এবং নির্দিষ্ট মেহর (দেনমোহর) নির্ধারণ করা হয়। নির্দিষ্ট সময় সীমা অতিক্রম হওয়ার সাথে সাথে আপনা হতে এ বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়। এর জন্য তালাকের দরকার হয় না।

মুত’আ বিবাহ বর্তমান সমাজে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত নয়, তবে নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত পরিসরে কিছু শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত।

ইরানে সরকারীভাবে প্রচলিত এই মুতা’আ বিবাহ বা অস্থায়ী দাম্পত্য সম্পর্ক।

মুত’আ বিবাহের ইতিহাস: মুত’আ বিবাহ প্রথমে ইসলামের প্রাথমিক সময়কালে মক্কায় অনুমোদিত ছিল, বিশেষ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিম যোদ্ধাদের জন্য। তখন যুদ্ধের সময় যোদ্ধাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য তাদের স্ত্রীর কাছে ফিরতে পারার সুযোগ ছিল না। তাই মুত’আ বিবাহের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, যাতে তারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি বৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

মুত’আ বিবাহের নিষেধাজ্ঞা: ইসলামের মূল শরীয়াহ অনুযায়ী, মুত’আ বিবাহ পরবর্তীতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কুরআনে মুত’আ বিবাহ সম্পর্কে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও, পরবর্তীতে এটি ইসলামি আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺমুতাহ বিবাহকে নিষিদ্ধ (হারাম) করেছেন।

مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّه“ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوه“ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِمَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

হাসান ইব্‌নু মুহাম্মাদ ইব্‌নু ‘আলী ও তাঁর ভাই ‘আবদুল্লাহ্‌ তাঁদের পিতা থেকে বর্ণিতঃ

‘আলী (রাঃ) ইব্‌নু ‘আব্বাস (রাঃ) – কে বলেছেন, **নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বর যুদ্ধে মুত’আহ বিয়ে** এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খাওয়া **নিষেধ করেছেন।**

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫১১৫) [১৬]

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي . وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي . وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَ كُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي . فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا " .

রাবী’ ইবনু সাবরাহ্‌ আল জুহানী (রহঃ) থেকে তাঁর পিতা সাবরাহ (রাযিঃ)–এর সূত্র থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মুত্‌’আর অনুমতি দিলেন। অতঃপর আমি ও অপর এক ব্যক্তি বানূ ‘আমির গোত্রের একটি মহিলার নিকট গেলাম। সে ছিল দেখতে লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট তরুণ উষ্ট্রীর ন্যায়। আমরা নিজেদেরকে তার নিকট (মুত্‌’আহ্‌

বিবাহের জন্য) পেশ করলাম। সে বলল, আমাকে কী দিবে? আমি বললাম , আমার চাদর। আমার সাথীও বলল আমার চাঁদর। আমার চাদরের তুলনায় আমার সঙ্গীর চাদরটি বেশি উৎকৃষ্টতর; কিন্তু আমি ছিলাম তুলনায় কম বয়সের যুবক। সে যখন আমার সঙ্গীর চাদরের প্রতি তাকায় তখন তা তার পছন্দ হয় এবং বলল, তুমি এবং তোমার চাদর ই আমার জন্য যথেষ্ট। অতএব আমি তার সাথে তিন দিন অতিবাহিত করলাম। **অতপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ কারো কাছে মুত্’আহ্ বিবাহের সূত্রে কোন স্ত্রী লোক থাকলে সে যেন তার পথ ছেড়ে দেয় (ত্যাগ করে)।**
(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৩১০) [১৭]

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ " أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ " .

রাবী’ ইবনু সাবরাহ আল জুহানী (রহঃ) তাঁর পিতার সুত্র থেকে বর্ণিতঃ
রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুত্’আহ্ নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন, সাবধান! আজকের এ দিন থেকে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত মুত্’আহ্ হারাম। যে কেউ (ইতোপূর্বে) মুত’আহ্ বাবদ যা কিছু দিয়েছে, সে যেন তা ফেরত না দেন।
(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৩২১) [১৮]
এই হাদিসগুলো থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মুত’আ বিবাহ বা অস্থায়ী দাম্পত্য সম্পর্ক ইসলামে হারাম ।
মুত’আ বিবাহের ক্ষতিকারক দিক

- পরিবার ব্যবস্থা ধ্বংস: মুত’আ বিবাহ পরিবারের স্থায়ীত্ব এবং সংহতির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, কারণ এটি শারীরিক সম্পর্ককে অস্থায়ী করে তোলে এবং নৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।
- সামাজিক অবক্ষয়: এটি সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে, কারণ মুত’আ বিবাহের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক ও দায়িত্বশীলতা থেকে মুক্ত থাকার ফলে দায়িত্বহীনতা এবং অশান্তি তৈরি হতে পারে।

অধ্যায় ৪: ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশিপ

৪.১ ইসলামের মানদন্ড

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম, দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের প্রতিটি দিকনির্দেশনার জন্য বিধান প্রদান করেছে।

ইসলাম কোনো কাজকে বৈধ বা অবৈধ ঘোষণা করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে।

কোনো চিন্তা, বিশ্বাস, কাজ বা আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে সত্য, ন্যায়সঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য কি না, তা যাচাই করার মূল ভিত্তি বা মাপকাঠি হলো ৪ টি।

১. আল-কুরআন: ইসলামের সর্বপ্রথম ও প্রধান মানদণ্ড। আল্লাহর বাণী হিসেবে এতে হালাল-হারাম, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সবকিছুর নির্দেশনা রয়েছে।

২. হাদীস (সুন্নাহ):রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, কাজ ও অনুমোদন—যা কুরআনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ।

এটি কুরআনের পর ইসলামী শরীয়াহর দ্বিতীয় উৎস।

৩. ইজমা (সম্মতিমত): সাহাবায়ে কিরাম বা পরবর্তীকালের আলেমগণের ঐকমত্য। কোনো বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ইসলামী শরীয়াহর একটি মানদণ্ড।

৪. কিয়াস (তুলনামূলক যুক্তি): কুরআন ও হাদীসে সরাসরি না থাকলেও অনুরূপ বিষয়ে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। এটা মূলত ইসলামি ফিকহের একটি সূত্র।

মানদণ্ড হিসেবে ইসলামে দেখা হয়:

কোনো কাজ আল্লাহর বিধানের সাথে মিলছে কি না।

রাসূল (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ অনুযায়ী হচ্ছে কি না।

মানুষের কল্যাণ ও ফিতরাতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না।

নৈতিকতা ও ইনসাফ বজায় রাখা হচ্ছে কি না।

৪.২ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম সম্পর্ক বিশ্লেষণে ‘ইসলামের মানদণ্ড’ অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা

ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো কাজ, আচরণ বা সম্পর্ক হালাল না হারাম—তা নির্ধারণের জন্য কিছু নির্ভরযোগ্য ও অপরিবর্তনীয় মানদণ্ড রয়েছে। যেমন: আল-কুরআন, সহীহ হাদীস, ইজমা (ঐক্যমত) ও কিয়াস (তুলনামূলক বিশ্লেষণ)। এই মানদণ্ডসমূহ ইসলামের বিচারপ্রণালী ও

বিধান নির্ধারণের মূল ভিত্তি। হারাম সম্পর্ক সম্পর্কিত একটি থিসিসে ইসলামের এই মানদণ্ড ব্যাখ্যা করা অপরিহার্য, কারণ এটি গবেষণার বুনিয়াদ গড়ে দেয় এবং সমস্ত বিশ্লেষণকে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে স্থাপন করে। এ ছাড়া, বর্তমান সমাজে অনেক সম্পর্ককে মানুষ সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য মনে করলেও, ইসলাম সেসবকে হারাম গণ্য করে। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন সম্পর্ক বৈধ এবং কোনটি হারাম—তা যাচাইয়ের জন্য ইসলাম যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে, তা আগে পরিষ্কার না করলে হারাম সম্পর্কের শরঈ ব্যাখ্যা অস্পষ্ট থেকে যাবে। অতএব, হারাম সম্পর্কের প্রকারভেদ ও তার শরঈ বিশ্লেষণে ইসলামের মানদণ্ডকে ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশিপ সম্পর্কে একটি আয়াতে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা এসেছে, যা হলো:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“তোমরা ব্যভিচারের ধারে-কাছে যেও না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।”

(সুরা আল-ইসরা: ৩২) [৭]

এই আয়াতের আলোকে হারাম সম্পর্কের ব্যাখ্যা:

এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম এমন সম্পর্ককে হারাম ঘোষণা করেছে, যা বৈধ বিবাহের বাইরের ৩.৪ এর উপস্থাপিত সম্পর্কগুলোই।

আল্লাহ্ ﷻ শুধু যিনাকে হারাম বলেননি, বরং বলেছেন “ধারে-কাছে যেও না”, অর্থাৎ, হারাম সম্পর্কের সূচনা যেসব মাধ্যমে হয়—সেগুলোও নিষিদ্ধ। এই আয়াত ইসলামি নৈতিকতার একটি মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করে, যা হলো: হারামের পথও হারাম।

ইসলামী শরীআতের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা হলো—যদি কোনো কাজ মূলত হারাম হয়, তাহলে সে কাজের দিকে নিয়ে যায় এমন প্রতিটি মাধ্যমও হারাম বিবেচিত হবে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যাতে কোনোভাবে গুনাহর পথে না যেতে পারে এবং সমাজে অনৈতিকতা ছড়িয়ে না পড়ে।

আল্লাহ্ﷻ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা কঠোর শাস্তিদাতা ।”

(সুরা আল-মায়েদাহ: ২) [১৯]

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে পাপের কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করাও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং, কেউ যদি সরাসরি কোনো হারাম সম্পর্কে জড়িত না থেকেও তা ঘটার সুযোগ তৈরি করে, উৎসাহ দেয় কিংবা তাতে সহায়তা করে, তাহলে সে-ও গুনাহের অংশীদার হবে।

হারাম সম্পর্ক যেমন—বিবাহ বহির্ভূত প্রেম, পরকীয়া, পর্দা লঙ্ঘন, সমকামীতা ইত্যাদি—এগুলো যেমন স্পষ্ট হারাম, তেমনি এগুলোর দিকে ধাবিত করে এমন মাধ্যম যেমন—একান্তে কথা বলা, গোপনে দেখা করা, প্রেমভিত্তিক গান, মুভি দেখা, প্রেমের পরামর্শ দেওয়া, কিংবা এমন বন্ধুত্ব তৈরি করা যা ধীরে ধীরে হারাম সম্পর্কে রূপ নেয়—সবই ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

এভাবে ইসলাম শুধু ফলাফলকে নয়, বরং গুনাহের দিকে নিয়ে যায় এমন সকল দিক ও মাধ্যমকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, যাতে মুসলমান সমাজ নৈতিকতা ও পবিত্রতার পথে অটল থাকতে পারে।

অধ্যায় ৫ : কুরআনের আলোকে হারাম রিলেশনশিপ

কুরআন আল্লাহর সরাসরি বানী বা কালাম। এটি কোনো মানুষের রচনা নয়। আল্লাহ্ ﷻ কুরআনুল কারীমে মানুষের প্রতিটি দিকনির্দেশনার জন্য বিধান প্রদান করেছে। আল্লাহ্ ﷻ কুরআনুল কারীমে কিছু সম্পর্ক নিষিদ্ধ করেছেন আর সেগুলো ই হচ্ছে হারাম সম্পর্ক। এমন সম্পর্কে জড়ানো গুনাহের কাজ।

কুরআনের আলোকে হারাম সম্পর্কসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

৫.১ যিনা (ব্যভিচার)

যিনা বলতে এমন শারীরিক সম্পর্ককে বোঝানো হয় যা বৈধ বিবাহের বন্ধনের বাইরে ঘটে থাকে। এটি নারীর সাথে পুরুষের অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক, যা বৈধ নিকাহ ছাড়া হয়ে থাকে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ﷻ বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"তোমরা ব্যভিচারের ধারে-কাছে যেও না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।"

(সুরা আল-ইসরা: ৩২) [৭]

তাফসীর:

আল্লাহ তাআলা ব্যভিচার ও ওর চতুষ্পর্শ্বের সমস্ত দুষ্কার্য হতে চরমভাবে নিষেধ করেছেন। শরীয়তে ব্যভিচারকে কাবীরা ও কঠিন পাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, একজন যুবক রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে। ব্যভিচারের অনুমতি প্রার্থনা করে। জনগণ প্রতিবাদ করে বলেঃ চুপ কর, কি বলছো?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেনঃ বসে যাও।" সে বসে গেলে তিনি তাকে বলেনঃ তুমি এই কাজ কি তোমার মায়ের জন্যে পছন্দ কর?" উত্তরে সে বলেঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ আমাকে আপনার উপর উৎসর্গ করুন! আল্লাহর কসম! আমি কখনো এটা পছন্দ করি না।" তখন তিনি তাকে বললেনঃ তাহলে অন্য কেউ এটাকে কি করে পছন্দ করতে পারে?" এরপর তিনি তাকে বললেনঃ আচ্ছা, এই কাজটি তুমি। তোমার মেয়ের জন্যে পছন্দ কর কি?" লোকটি চরমভাবে এটাও অস্বীকার করলো। তিনি বললেনঃ ঠিক এরূপই অন্য কেউই এটা তার মেয়ের জন্যে পছন্দ করে না। তারপর তিনি বললেনঃ তুমি তোমার বোনের জন্যে এটা পছন্দ করবে কি?" অনুরূপভাবে সে এটাকেও অস্বীকার করলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ এইরূপ অন্যেরাও তাদের বোনদের জন্যে এটাকে অপছন্দ করবে।" অতঃপর তিনি বললেনঃ কেউ তোমার ফুফুর সাথে এই কাজ করুক এটা তুমি পছন্দ কর কি?" সে এটাকেও কঠিনভাবে অস্বীকার করলো। তিনি বললেনঃ অনুরূপ ভাবে অন্যেরাও এটা পছন্দ করবে না।" এরপর তিনি। বলেনঃ তোমার খালার জন্যে এ কাজ তুমি পছন্দ কর কি?" উত্তরে সে বলেঃ কখনই নয়।" তিনি বললেনঃ এইরূপ সবাই এটা অপছন্দ করে।" অতঃপর তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক তার মস্তকের উপর স্থাপন করে দুআ করলেনঃ হে আল্লাহ! আপনি এর পাপ মার্জনা করুন! এর অন্তর পবিত্র করে দিন এবং একে অপবিত্রতা হতে বাঁচিয়ে নিন!" অতঃপর তার অবস্থা এমন হলো যে, সে কোন মহিলার দিকে দৃষ্টিপাতও করতো না।ইবনু আবিদ দুনিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ শিরকের পরে ব্যভিচার হতে বড় পাপ আর কিছুই নেই যে, মানুষ তার শুক্র এমন গর্ভাশয়ে নিক্ষেপ করবে যা তার জন্যে বৈধ নয়।"
(তাফসীরে ইবনে কাছীর)[২০]

আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না (অর্থাৎ এর প্রাথমিক কারণাদি থেকেও বেঁচে থাক)। নিশ্চয় এটা (নিজেও) নিতান্ত অশ্লীল কাজ এবং (অন্যান্য অনিষ্টের দিক দিয়েও) মন্দ পথ। (কেননা, এর পরিণতিতে শত্রুতা, গোলযোগ এবং বংশবিকৃতি দেখা দেয়।)
ব্যভিচারের অবৈধতা সম্পর্কে এটি সপ্তম নির্দেশ। এতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এক. এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায় । এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت অর্থাৎ তোমার লজ্জাই যখন লোপ পাবে, তখন যা খুশি তাই করতে পার। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) লজ্জাকে ঈমানের

গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেনঃ (الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِবুখারী)। দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়। বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি-ডাকাতি ও হত্যার যে ছড়াছড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তার অর্ধেকের চাইতে বেশি ঘটনার কারণ কোন পুরুষ ও নারী যারা এ অপকর্মে লিপ্ত। এ অপরাধটি যদিও সরাসরি বান্দার হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; কিন্তু এখানে বান্দার হক সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এ অপরাধটি এমন অনেকগুলো অপরাধ সঙ্গে নিয়ে আসে, যার দ্বারা বান্দার হক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হত্যা ও লুটতরাজের হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। এ কারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তিও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী বিবাহিত যিনাকারদের প্রতি অভিসম্পাত করে । জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরাও তা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। আগুনের আযাবের সাথে সাথে জাহান্নামে তাদের লাঞ্ছনাও হতে থাকবে। (বাযযার)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বাচনিক অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যিনাকার ব্যক্তি যিনা করার সময় মু'মিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মু'মিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্য পান করার সময় মু'মিন থাকে না। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে এর ব্যাখ্যা এই যে, এসব অপরাধী যখন অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন ঈমান তাদের অন্তর থেকে বাইরে চলে আসে। এরপর যখন অপরাধ থেকে ফিরে আসে, তখন ঈমানও ফিরে আসে। (মাযহারী)

(তাফসীরে মাআ'রিফুল কুরআন) [২১]

৫.২ সমকামী সম্পর্ক

এই ব্যাপারে আল্লাহ্ ﷻকুরআনে এরশাদ করেছেন:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি ?

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾
তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।

(সূরা আল-আ'রাফ: ৮০-৮১) [১০]

তাফসীর:
'ঐ সময়টিও স্মরণযোগ্য যখন আমি (আল্লাহ) লুত (আঃ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করেছিলাম । সে তার কওমকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছিল। লুত (আঃ) ছিলেন নূত ইবনে হারূন ইবনে আযর। তিনি হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তিনিও ঈমান আনয়ন করেছিলেন এবং তাঁর সাথে সিরিয়ার দিকে হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আহলে সুদূমের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি সুদূমবাসীকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন এবং সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতেন। তারা এমন নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজের আবিষ্কার করেছিল যা হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তাদের ছাড়া অন্য কোন জাতি সেই কাজে লিপ্ত হয়নি। তারা নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের কাছে কু-কাজের জন্যে আসতো। এ কাজের কল্পনা আজ পর্যন্ত কারো মনেও জাগ্রত হয় নি এবং আজ পর্যন্ত বানী আদম এ কাজে কখনও জড়িত হয়নি। জামে' দামেশকের প্রতিষ্ঠাতা উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিক বলেছিলেনঃ যদি আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে লূত সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনা না করতেন তবে আমার এ বিশ্বাসই হতো না যে, কোন পুরুষ তাক অন্য কোন পুরুষ লোকের সাথে এরূপ কাজ করতে পারে!" সুতরাং হযরত লুত (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেনঃ তোমরা এমন অশ্লীল ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছে যে কাজ তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আর কেউই করে নি। তোমরা নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষ লোকদের কাছে আসছে এবং তাদের দ্বারা নিজেদের যৌন ক্রিয়া নিবারণ করে নিচ্ছো? বাস্তবিকই এটা তোমাদের সীমালংঘন ও বড় রকমের অজ্ঞতাই বটে! যে জিনিসের যেটা স্থান নয় তোমরা ওকে ওরই স্থান বানিয়ে নিচ্ছো।" এরপর অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক (হযরত লুতের আঃ কথা নকল করে) বলেনঃ এরা আমার কন্যা যার সাথে চাও সম্পর্ক স্থাপন কর।" তারা বললোঃ (হে লূত আঃ)! তুমি তো জান যে, তোমার এই পার্থিব কন্যাদের কোনই প্রয়োজন আমাদের নেই। যাদের প্রয়োজন আমাদের রয়েছে তা তোমার জানা আছে।" মুফসিরগণ বর্ণনা করেছেন যে, পুরুষ নিজের প্রয়োজন পুরুষ দ্বারা পূর্ণ করে

নিতো এবং নারীরাও তাদের প্রয়োজন নারীদের দ্বারাই পূর্ণ করে নিতো। আর ওটা ছাড়া তাদের কোন উপায়ও ছিল না।

(তাফসীরে ইবনে কাছীর)[২০]

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লূত (আ)-কে তাদের হিদায়তের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি স্বজাতিকে হুঁশিয়ার করে বলেনঃ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَঅর্থাৎ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি?

যিনা তথা ব্যভিচার সম্পর্কে কোরআন পাক إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةًআলিফ ও লাম ব্যতিরেকেই فَاحِشَةًশব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু এখানে আলিফ-লামসহ الفاحشةবলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ স্বভাববিরুদ্ধ ব্যভিচার যেন একাই সমস্ত অশ্লীলতার সমাহার এবং যিনার চাইতেও কঠোর অপরাধ।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদের এ নির্লজ্জতাকে আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলা হয়েছেঃ তোমরা নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ কর। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের স্বভাবজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা একটি হালাল ও জায়েয পন্থা নির্ধারণ করেছেন এবং তা হচ্ছে নারীদের বিয়ে করা। এ পন্থা ছেড়ে অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা একান্ত হীনতা ও বিকৃত চিন্তারই পরিচায়ক।

(তাফসীরে মাআ'রিফুল কুরআন) [২১]

৫.৩ মাহরাম নারী-পুরুষের মধ্যে বিয়ে বা শারীরিক সম্পর্ক ও অস্থায়ী দাম্পত্য সম্পর্ক (মুতআ' বিবাহ)

এই ব্যাপারে আল্লাহ্ ﷻকুরআনে এরশাদ করেছেন:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকণ্যা; ভগিনীকণ্যা তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকরী, দয়ালু।
(সূরা আন-নিসা:২৩) [১৫]

তাফসীর:
আলোচ্য আয়াতসমূহে যাদের সাথে বিয়ে হারাম, এমন নারীদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন হারাম নারী কোন অবস্থাতেই হালাল হয় না; তাদেরকে ‘মোহাররামাতে-আবাদীয়্যা’ (চিরতরে হারাম) বলা হয়। কোন কোন নারী চিরতরে হারাম নয়, কোন কোন অবস্থায় তারা হালালও হয়ে যায়।

প্রথমোক্ত তিন প্রকারঃ (১) বংশগত হারাম নারী, (২) দুধের কারণে হারাম নারী এবং (৩) শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী চিরতরে হারাম। শেষোক্ত এক প্রকার অর্থাৎ পর-স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত পরের স্ত্রী থাকে তখন পর্যন্ত হারাম।

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ
– জাহিলিয়াত যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্রেরা বিনাদ্বিধায় বিয়ে করে নিতো। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা’আলা এই নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং একে ’আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ’ বলে অভিহিত করেছেন। বলা বাহুল্য, যাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মা বলা হয়, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা মানব-চরিত্রের জঘন্য অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ
– জাহিলিয়াত যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্রেরা বিনাদ্বিধায় বিয়ে করে নিতো। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা’আলা এই নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং একে ’আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ’ বলে অভিহিত করেছেন। বলা বাহুল্য, যাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মা বলা হয়, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা মানব-চরিত্রের জঘন্য অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

মাসআলাঃ আয়াতে পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম বলা হয়েছে। এতে এরূপ কোন কথা নেই যে, পিতা যদি তার সাথে সহবাসও করে। কাজেই যে কোন স্ত্রীলোকের সাথে পিতার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে পুত্রের পক্ষে তাকে বিয়ে করা কখনও হালাল নয়। এমনিভাবে পুত্রের স্ত্রীকে পিতার পক্ষে বিয়ে করা হালাল নয়; যদিও পুত্র শুধু বিয়েই করে–সহবাস না করে। আল্লামা শামী বলেনঃ

تحرم زوجة الأصل والفرع بمجرد العقد دخل بها أولا

মাসআলাঃ যদি পিতা কোন স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করে, তবুও তাকে বিয়ে করা পুত্রের পক্ষে হালাল নয়।

— حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ অর্থাৎ আপন জননীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে। শব্দের ব্যাপকতায় দাদী, নানী সবই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

— وَبَنَاتُكُمْ স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। কন্যার কন্যাকে এবং পুত্রের কন্যাকেও বিয়ে করা হারাম।

মোটকথা কন্যা, পৌত্রী, প্রপৌত্রী, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী এদের সবাইকে বিয়ে করা হারাম এবং অন্য স্বামীর ঔরসজাত সৎকন্যাকে বিয়ে করা জায়েয কি না— সে সম্পর্কে পরে বর্ণনা করা হবে। যে পুত্র-কন্যা ঔরসজাত নয়; বরং পালিত, তাদের এবং তাদের সন্তানকে বিয়ে করা জায়েয—যদি অন্য কোন পথে অবৈধতা না থাকে। এমনিভাবে ব্যভিচারের মাধ্যমে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সেও কন্যারই পর্যায়ভুক্ত। তাদের বিয়ে করাও দুরস্ত নয়।

– وَأَخَوَاتُكُمْ সহোদরা ভগিনীকে বিয়ে করা হারাম। এমনিভাবে বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী ভগিনীকেও বিয়ে করা হারাম।

– وَعَمَّاتُكُمْ পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী বোনকে বিয়ে করা হারাম। তিন প্রকার ফুফুকেই বিয়ে করা যায় না।

— وَخَالَاتُكُمْ আপন জননীর তিন প্রকার বোন (মায়ের আপন বোন, বাপ শরীক বোন, মা শরীক বোন এবং দুধ বোন) প্রত্যেকের সাথেই বিয়ে করা হারাম।

– وَبَنَاتُ الْأَخِ ভ্রাতুষ্পুত্রীর সাথেও বিয়ে হারাম, আপন হোক, বৈমাত্রেয় হোক— বিয়ে হালাল নয়।

– وَبَنَاتُ الْأُخْتِ বোনের কন্যা অর্থাৎ ভাগ্নীর সাথেও বিয়ে করা হারাম। এখানেও বোনকে ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে।

— وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ যেসব নারীর স্তন্যপান করা হয়, তারা জননী না হলেও বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে জননীর পর্যায়ভুক্ত এবং তাদের সাথে বিয়ে হারাম। অল্প দুধ পান করুক কিংবা বেশি, একবার পান করুক কিংবা একাধিক বার—সর্বাবস্থায় তারা হারাম হয়ে যায় । ফিকহবিদদের পরিভাষায় একে 'হুরমতে-রিযাআত' বলা হয়।

তবে এতটুকু স্মরণ রাখা জরুরী যে, শিশু অবস্থায় দুধ পানের সময়ে দুধ পান করলেই এই হুরমতে-রিযাআত কার্যকরী হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ – إنما الرضاعة من المجاعة অর্থাৎ দুধ পানের কারণে যে অবৈধতা প্রমাণিত হয়, তা সে সময়ে দুধ পান করলে হবে, যে সময় দুধ পান করে শিশু শারীরিক দিক দিয়ে বর্ধিত হয়। —(বুখারী, মুসলিম)

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এই সময়কাল হচ্ছে শিশুর জন্মের পর থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)সহ অন্যান্য ফিকহবিদের মতে মাত্র দুবছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করলে অবৈধতা প্রমাণিত হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর ফতোয়াও তাই। কোন বালক-বালিকা যদি এ বয়সের পর কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করে, তবে এতে দুধ পানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

– وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ অর্থাৎ দুধ পানের সাথে সম্পর্কিত যেসব বোন আছে, তাদেরকে বিয়ে করা হারাম। এর বিশদ বিবরণ এই যে, দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়কালে কোন বালক অথবা বালিকা কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে সে তাদের মা এবং তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে যায়। এছাড়া সে স্ত্রীলোকের আপন পুত্র-কন্যা তাদের ভাই-বোন হয়ে যায়। অনুরূপ সে স্ত্রীলোকের বোন তাদের খালা হয়ে যায় এবং সে স্ত্রীলোকের ভাসুর ও দেবররা তাদের চাচা হয়ে যায়। তার স্বামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু হয়ে যায়। দুধ পানের কারণে তাদের সবার পরস্পরে বৈবাহিক অবৈধতা স্থাপিত হয়ে যায়। বংশগত সম্পর্কের কারণে পরস্পরে যেসব

বিয়ে হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণে সেসব সম্পর্কীয়দের সাথে বিয়ে হারাম হয়ে যায়। মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে—রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب

মাসআলাঃ একটি বালক ও একটি বালিকা কোন মহিলার দুধ পান করলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। এমনিভাবে দুধ ভাই ও বোনের কন্যার সাথেও বিয়ে হতে পারে না।

মাসআলাঃ দুধ ভাই কিংবা দুধ বোনের বংশগত মাকে বিয়ে করা জায়েয এবং বংশগত বোনের দুধ-মাকেও বিয়ে করা হালাল। এমনিভাবে দুধ বোনের বংশগত বোনের সাথে এবং বংশগত বোনের দুধ-বোনের সাথেও বিয়ে জায়েয।

মাসআলাঃ দুধ পানের সময়কালে মুখ কিংবা নাকের পথে দুধ ভেতরে গেলেও অবৈধতা প্রমাণিত হয়। যদি অন্য কোন পথে দুধ ভেতরে প্রবেশ করানো হয় কিংবা দুধের ইনজেকশন দেওয়া হয়, তবে অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

মাসআলাঃ স্ত্রীলোকের দুধ ছাড়া অন্য কোন দুধ ; যেমন চতুষ্পদ জন্তু কিংবা পুরুষের দুধ দ্বারা অবৈধতা প্রমাণিত হয় না।

মাসআলাঃ যদি দুধ ঔষধে কিংবা গরু-ছাগলের দুধের সাথে মিশ্রিত হয়, তবে দুধ পানজনিত অবৈধতা তখন প্রমাণিত হবে, যখন নারীর দুধ পরিমাণে অধিক হয়। সমান সমান হলেও অবৈধতা প্রমাণিত হয়, কম হলে নয়।

মাসআলাঃ কোন পুরুষের বুকে যদি দুধ হয় এবং তা কোন শিশু পান করে তবে এ দুধ পানের দ্বারা দুধ পানজনিত অবৈধতা বর্তায় না।

মাসআলাঃ দুধ পান করার ব্যাপারে সন্দেহ হলে তদ্দ্বারা অবৈধতা প্রমাণিত হয় না। যদি কোন মহিলা কোন শিশুর মুখে স্তন দেয়, কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তবে তাতে অবৈধতা প্রমাণিত হবে না এবং বিয়ে হালাল হবে।

মাসআলাঃ এক ব্যক্তি কোন এক স্ত্রীলোককে বিবাহ করলো, অতঃপর অন্য এক মহিলা বললোঃ আমি তোমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছি, যদি তারা উভয়ে এ কথার সত্যায়ন করে, তবে বিয়ে ফাসেদ বলে ফয়সালা হবে। পক্ষান্তরে উভয়ে যদি মিথ্যা বলে এবং মহিলা ধার্মিকা ও আল্লাহভীরু হয়, তবু বিয়ে ফাসেদ বলে ফয়সালা হবে না। কিন্তু এর পরও তালাকের মাধ্যমে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া উত্তম।

মাসআলাঃ দুধপান জনিত অবৈধতা প্রমাণ করার জন্য দুইজন ধার্মিক পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা দুগ্ধপান প্রমাণিত হবে না। কিন্তু ব্যাপারটি যেহেতু হারাম ও হালালের, তাই সাবধানতা উত্তম। এমন কি কোন কোন ফিক্‌হবিদ লিখেছেন যে, যদি কোন মহিলা বিয়ে করার সময় একজন ধার্মিক পুরুষ সাক্ষ্য দেয় যে, এরা উভয়েই দুধ ভাইবোন, তবে বিয়ে জায়েয হবে না। বিয়ের পরে সাক্ষ্য দিলে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই উত্তম। এমনকি একজন মহিলা সাক্ষ্য দিলেও বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করাই উত্তম হবে।

মাসআলাঃ দু’জন ধার্মিক পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা যেমন দুগ্ধপানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত হয়, তেমনি একজন ধার্মিক পুরুষ ও একজন ধার্মিকা স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারাও এ অবৈধতা প্রমাণিত হয়ে থাকে। তবে সাক্ষীর নির্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ না হলেও সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য অবৈধতাকে অগ্রাধিকার দান করা উচিত।

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ — স্ত্রীদের মাতাও স্বামীর জন্য হারাম। এখানেও স্ত্রীদের নানী, দাদী বংশগত হোক কিংবা দুধগত—সবাই অন্তর্ভুক্ত।

মাসআলাঃ বিবাহিত স্ত্রীর মা যেমন হারাম, তেমনি ঐ মহিলার মাও হারাম, যার সাথে সন্দেহবশত সহবাস করে কিংবা ব্যভিচার করে কিংবা যাকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করে।

মাসআলাঃ শুধু বিবাহ দ্বারাই স্ত্রীর মা হারাম হয়ে যায়। এর জন্য সহবাস ইত্যাদি জরুরী নয়।

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

—যে মহিলাকে বিয়ে করে সহবাসও করেছে, সেই মহিলার অন্য স্বামীর ঔরসজাত কন্যা, পৌত্রী ও দৌহিত্রী হারাম হয়ে যায়। তাদেরকে বিবাহ করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি সহবাস না হয় শুধু বিয়ে হয়, তবে উল্লিখিত নারীরা হারাম হয় না। বিয়ের পর যদি তাকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করে কিংবা তার গুপ্ত অঙ্গের অভ্যন্তরে কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তবে এগুলোও সহবাসের পর্যায়ভুক্ত। ফলে স্ত্রীর কন্যা হারাম হয়ে যায়।

মাসআলাঃ এখানে نِسَائِكُمْ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত ; কাজেই ঐ মহিলার কন্যা, পৌত্রী ও দৌহিত্রীও হারাম হয়ে যায়, যার সাথে সন্দেহবশত সহবাস করে কিংবা ব্যভিচার করে।

— وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ পুত্রের স্ত্রী হারাম। পৌত্র, দৌহিত্রও পুত্র শব্দের ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাদের স্ত্রীকে বিয়ে করাও জায়েয হবে না।

— مِنْ أَصْلَابِكُمْ কথাটি পোষ্যপুত্রকে বাইরে রাখার উদ্দেশ্যে সংযোজিত হয়েছে। তার স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল। দুধ-পুত্রও বংশগত পুত্রের পর্যায়ভুক্ত, কাজেই তার স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম।

— وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ দুই বোনকে বিয়েতে একত্রিত করাও হারাম সহোদর বোন হোক কিংবা বৈমাত্রেয়ী কিংবা বৈপিত্রেয়ী হোক, বংশের দিক দিয়ে হোক, কিংবা দুধের দিক দিয়ে—এ বিধান সবার জন্য প্রযোজ্য। তবে এক বোনের তালাক হয়ে যাওয়ার পর ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেলে কিংবা মৃত্যু হলে অপর বোনকে বিয়ে করা জায়েয ইদ্দতের মাঝখানে জায়েয নয়।

মাসআলাঃ যেভাবে এক সাথে দুই বোনকে এক ব্যক্তির বিয়েতে একত্রিত করা হারাম, তেমনি ফুফু, ভ্রাতুষ্পুত্রী ও খালা ও ভাগ্নেয়ীকেও এক ব্যক্তির বিয়েতে একত্রিত করা হারাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ)لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها বুখারী, মুসলিম)

মাসআলাঃ ফিকহবিদগণ একটি সামগ্রিক নীতি হিসাবে লিখেছেনঃ প্রত্যেক এমন দুজন মহিলা, যাদের মধ্যে একজনকে পুরুষ ধরা হলে শরীয়ত মতে উভয়ের পরস্পর বিয়ে দুরস্ত হয় না, তারা একজন পুরুষের বিয়েতে একত্রিত হতে পারে না।

— إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ অর্থাৎ জাহিলিয়াত যুগে যা কিছু হয়েছে, তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। এ বাক্যটি وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ আয়াতেও উল্লিখিত হয়েছে। সেখানেও এই অর্থই যে, জাহিলিয়াত যুগে যা কিছু ঘটেছে, মুসলমান হওয়ার পর তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। তবে ভবিষ্যতে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

এমনিভাবে নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার সময় পিতার বিবাহিতা স্ত্রী কিংবা দুই বোন একত্রিত থাকলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো জরুরী। দুই বোন থাকলে এক বোনকে পৃথক করে দেওয়া অপরিহার্য।

বারা ইবনে আযেবের রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বুরদা ইবনে দীনারকে জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করার নির্দেশ নিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। কারণ সে পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। (মিশকাত)

ইবনে-ফিরোয দায়লামী পিতার কথা বর্ণনা করেনঃ যখন আমি মুসলমান হই, তখন দুই বোন এক সঙ্গে আমার স্ত্রী ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি বললেনঃ তাদের একজনকে তালাক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দাও এবং একজনকে রেখে দাও।—(মিশকাত)

এ সব রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, মুসলমান অবস্থায় যেমন প্রাথমিক পর্যায়ে পিতার বিবাহিতা স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রিত করা জায়েয নয়, তেমনি কাফির অবস্থায় এরূপ বিয়ে হয়ে থাকলে মুসলমান হওয়ার পর তা বহাল রাখাও জায়েয হবে না।

— إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا মুসলমান হওয়ার পূর্বে তারা নির্বুদ্ধিতাবশত যা কিছু করেছে, মুসলমান হওয়ার পর আল্লাহ্ তার জন্য তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং তাদের প্রতি দয়ার চোখে চাইবেন।

– وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ অর্থাৎ যাদের স্বামী রয়েছে, এমন (সধবা) নারীও হারাম। যতদিন কোন মহিলা কোন ব্যক্তির স্ত্রী থাকে, অন্য ব্যক্তি তাকে বিয়ে করতে পারে না। এ থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, একজন মহিলা একই সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। বর্তমান যুগের কোন কোন মূর্খ ধর্মদ্রোহী বলতে শুরু করেছে যে, পুরুষদের জন্য যখন একাধিক স্ত্রীর অনুমতি রয়েছে, তখন নারীদের জন্যও একাধিক স্বামী ভোগ করার অনুমতি থাকা উচিত। এ দাবি আলোচ্য আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই মূর্খরা বোঝে না যে, পুরুষের জন্য বহু-বিয়ে একটি নিয়ামত। এটা প্রত্যেক ধর্ম ও সম্প্রদায়ে বৈধ। মানবেতিহাস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু নারীর জন্য এক সময়ে একাধিক স্বামী থাকা স্বয়ং নারীর জন্যও বিপদের কারণ এবং যে দুজন পুরুষ এক নারীকে বিয়ে করবে, তাদের জন্যও নিছক নির্লজ্জতা। এ ছাড়া এতে সন্তানের বংশ নির্ধারণেরও কোন পথ খোলা থাকে না। যখন কয়েকজন পুরুষ একজন নারীকে ভোগ করবে, তখন যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তাকে তাদের মধ্য থেকে কোন একজনের সন্তান সাব্যস্ত করার কোন উপায় থাকবে না। এ ধরনের জঘন্যতম দাবি তারাই করতে পারে, যারা মানবতার জঘন্য দুশমন এবং যাদের লজ্জাশরমের ধারণা পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। সন্তান ও পিতা-মাতার অধিকারের মাধ্যমে যে রহমত আত্মপ্রকাশ করে, এরা তা থেকে সমগ্র মানবতাকে বঞ্চিত করার প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে। যখন বংশ প্রমাণিত হবে না, তখন পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের দায়িত্ব কার স্কন্ধে আরোপ করা হবে?

খাঁটি স্বভাব ও যুক্তির দিক দিয়েও যদি দেখা যায়, তবে একজন নারীর জন্য একাধিক স্বামী থাকার কোন বৈধতা দৃষ্টিগোচর হয় না।

(১) বিয়ের বুনিয়াদী লক্ষ্য হচ্ছে বংশ বিস্তার। এ দিক দিয়ে একাধিক মহিলা তো একজন পুরুষ দ্বারা গর্ভবতী হতে পারে; কিন্তু একজন নারী একাধিক পুরুষ দ্বারা গর্ভবতী হতে পারে না। সে একজন দ্বারাই গর্ভবতী হবে। তাই একাধিক স্বামী থাকা অবস্থায় একজন ছাড়া অবশিষ্ট সব স্বামীর শক্তি বিনষ্ট হবে। কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া তাদের আর কোন উপকার অর্জিত হবে না।

(২) অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, নারী নরের তুলনায় অবলা। সে বছরের অধিকাংশ সময়ে ভোগ করারও যোগ্য থাকে না। কোন কোন অবস্থায় তার পক্ষে একজন স্বামীর হক পূর্ণ করাও সম্ভবপর হয় না। একাধিক স্বামী হলে কি অবস্থা হবে, তা অনুমান করা কষ্টকর নয়।

(৩) যেহেতু পুরুষ দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে নারীর তুলনায় অধিক সবল, তাই যদি কোন পুরুষের যৌনশক্তি স্বাভাবিকের চাইতে বেশি হয় এবং একজন নারী দ্বারা সে সন্তুষ্ট হতে না পারে, তবে তার জন্য বৈধ পন্থায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিয়ের সুযোগ থাকা দরকার। নতুবা সে অন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করবে এবং গোটা সমাজকে দূষিত করবে; কিন্তু নারী দ্বারা এমন অনর্থ সৃষ্টির আশংকা কম।

ইসলামী শরীয়তে এ বিষয়টির গুরুত্ব এত অধিক যে, শুধু স্বামীর বর্তমানে নারীর অন্য বিয়েকে হারাম করা হয়নি; বরং কোন নারীর স্বামী তালাক দিয়ে দিলে কিংবা মারা গেলে তার ইদ্দত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্তও অন্য কোন ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হতে পারে না।

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ - এর বাক্যটি وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ থেকে ব্যতিক্রম । উদ্দেশ্য এই যে, সধবা স্ত্রীকে অন্য ব্যক্তির বিয়ে করা জায়েয নয়। কিন্তু কোন নারী যদি মালিকানাধীন দাসী হয়ে আসে, তবে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। মুসলমানরা যদি দারুল হরবের কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এবং সেখান থেকে কিছু সংখ্যক নারী বন্দী করে আনে; তবে এদের মধ্যে যে নারী দারুল ইসলামে আসে এবং তার স্বামী দারুল হরবে থেকে যায়, তার বিয়ে দারুল ইসলামে আসার কারণে পূর্ব স্বামীর সাথে ভেঙে যায়। এখন এই নারী ইহুদী, খৃস্টান কিংবা মুসলমান হলে দারুল ইসলামের যে কোন মুসলমান তাকে বিয়ে করতে পারে। আমীরুল মু'মিনীন যদি তাকে দাসী করে কোন সিপাহীকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের মধ্যে দিয়ে

দেয়, তবুও তাকে ভোগ করা জায়েয। কিন্তু এই বিয়েও ভোগ করা এক হায়েয আসার পরে কিংবা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করার পর জায়েয হবে।

মাসআলাঃ যদি কোন কাফির মহিলা দারুল হরবে মুসলমান হয়ে যায় এবং তার স্বামী কাফির থাকে, তবে শরীয়তের বিচারক তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলবে। যদি সে অঙ্গীকার করে, তবে বিচারক তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ করবে। এ বিচ্ছেদ তালাক বলে গণ্য হবে। এরপর ইদ্দত অতিবাহিত হলে মহিলা যে কোন মুসলমানকে বিয়ে করতে পারবে।

– كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ যেসব হারাম নারীর কথা উল্লেখ করা হলো, তাদের অবৈধতা আল্লাহর পক্ষ থেকে মীমাংসিত।

কুরতুবী বলেনঃ ای حرمت هذه النساء كتابا من الله عليكم অর্থাৎ উপরোক্ত নারীদের বিয়ে না করার নির্দেশ আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের প্রতি মীমাংসিত করে দেওয়া হয়েছে।

– وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ অর্থাৎ উল্লিখিত হারাম নারীদের ছাড়া অন্যান্য নারী তোমাদের জন্য হালাল। উদাহরণত চাচার মেয়ে, খালার মেয়ে, মামাত বোন, মামা ও চাচার স্ত্রী—তাদের মৃত্যু অথবা তালাকের পর যদি তারা অন্য কোন সম্পর্ক দ্বারা হারাম না হয়। পালক পুত্রের স্ত্রী— যদি সে তালাক দিয়ে দেয় কিংবা মারা যায়, স্ত্রী মারা গেলে তার বোন ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার আছে যাদের সবাইকে - مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ এর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

মাসআলাঃ এক সময়ে চারজনের অধিক নারীকে বিবাহে রাখা জায়েয নয়। সূরা আন-নিসার শুরুতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। নিকটবর্তী কোন আয়াতে এর উল্লেখ না দেখে কেউ যেন ভুল করে না বসে যে, - مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ এর অর্থে ব্যাপকতার কারণে কোন বাধা-নিষেধ ছাড়াই নারীদেরকে বিয়ে করা জায়েয। এছাড়া অনেক হারাম নারীর কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিতও রয়েছে। তফসীর প্রসঙ্গে আমরা সেগুলো বর্ণনাও করেছি।

– أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ অর্থাৎ হারাম নারীদের বর্ণনা এজন্য করা হয়েছে, যাতে তোমরা স্বীয় অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে হালাল নারীদের তালাশ কর এবং তাদের বিয়ে কর।

আবূ বকর জাসসাস (র) 'আহ্কামুল-কোরআন'-এ লিখেছেনঃ এ থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল। এক. মোহর ব্যতীত বিয়ে হতে পারে না; এমন কি, যদি স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সিদ্ধান্ত নেয় যে, মোহর ব্যতীত বিয়ে হবে, তবুও মোহর অপরিহার্য হবে। এর বিবরণ ফিকহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। দুই মোহর এমন বস্তু হতে হবে, যাকে 'মাল' বলা যায়।

হানাফীদের মাযহাব এই যে, দশ দিরহামের কম মোহর হওয়া উচিত নয়। উল্লেখ্য যে, সাড়ে তিন মাষা রৌপ্যে এক দিরহাম হয়।

— مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ অর্থাৎ অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে হালাল নারী তালাশ কর এবং জেনো, মহিলাদের তালাশ সততা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য, যা বিয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। বিয়ের মাধ্যমে এটিই অর্জন করঃ অর্থ ব্যয় করে ব্যভিচারের জন্য নারী তালাশ করো না।

এতে বোঝা গেল যে, ব্যভিচারীও অর্থ ব্যয় করে, কিন্তু সে অর্থ ব্যয়ও হারাম। এ অর্থ দ্বারা যে নারী অর্জন করা হয়, তাকে ভোগ করা হালাল হয় না।

– غَيْرَ مُسَافِحِينَ শব্দ বৃদ্ধি করে ব্যভিচার নিষিদ্ধ করত এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ব্যভিচারের মধ্যে শুধু কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ও বীর্যপাত করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কেননা, এতে সন্তানের বাসনা ও বংশ রক্ষার ইচ্ছা থাকে না। মুসলমানদের পবিত্র থাকা এবং মানব-বংশ বৃদ্ধি করার জন্য স্বীয় শক্তিকে যথাস্থানে ব্যয় করা উচিত। এর পন্থা হচ্ছে বিয়ে ও খরিদমুক্ত ক্রীতদাসীর মালিকানা।

– فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً অর্থাৎ বিয়ের পরে যেসব নারীকে ভোগ করবে, তাদের মোহর দিয়ে দাও। এটা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে।

এ আয়াতে استمتاع ভোগ করা) বলে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা বোঝানো হয়েছে। যদি শুধু বিয়ে হয়, স্বামীর ঘরে না যায় এবং স্বামী ভোগ করার সুযোগ না পায়; বরং তার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয়, তবে অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হয়। ভোগ করার সুযোগ পেলেই সম্পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হয়। এ আয়াতে বিশেষভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, যখন তোমরা কোন নারীকে ভোগ করে ফেল, তখন তাকে মোহর দেওয়া তোমাদের উপর সর্বতোভাবে ওয়াজিব হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ত্রুটি করা শরীয়তের আইনের খেলাফ। মানবিক লজ্জাবোধেরও তাকীদ এই যে, বিয়ের উদ্দেশ্য যখন হাসিল হয়ে গেছে, তখন স্ত্রীর অধিকার

প্রদানে ত্রুটি ও টালবাহানা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তবে শরীয়ত স্ত্রীকে এ অধিকারও দেয় যে, মোহর 'মুয়াজ্জল' (অবিলম্বে পরিশোধযোগ্য) হলে মোহর পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে স্বামীর কাছে যেতে অস্বীকার করতে পারে।

মূতার অবৈধতাঃ – استمتاعশব্দটির মূল ধাতু হচ্ছে – م ت ع এর অর্থ ফল লাভ হওয়া। কোন ব্যক্তি অথবা অর্থের দ্বারা ফল লাভ করলে তাকে استمتاعবলা হয়। ব্যাকরণের দিক দিয়ে কোন শব্দের ধাতুতে سও تসংযুক্ত করলে চাওয়া ও অর্জনের অর্থ সৃষ্টি হয়। এই আভিধানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে - فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْএর সোজা অর্থ সমগ্র উম্মতের মতে আমরা এইমাত্র উপরে যা বর্ণনা করেছি, তাই। কিন্তু একদল বলে যে, এখানে পারিভাষিক এবং প্রচলিত 'মূতা' বোঝানো হয়েছে। তাদের মতে আয়াতটি মূতা হালাল হওয়ার প্রমাণ। অথচ যাকে মূতা বলা হয়, আয়াত مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَদ্বারা তা রদ হয়ে যাচ্ছে। এর ব্যাখ্যা পরে বর্ণিত হবে।

একদল লোক পরিভাষাগত মূতা বৈধ বলে দাবি করে। পরিভাষাগত মূতা হচ্ছে কোন নারীকে এরূপ বলা যে, এতদিনের জন্য এত টাকার বিনিময়ে কিংবা অমুক দ্রব্যের বিনিময়ে তোমার সাথে মূতা করছি। আলোচ্য আয়াতের সাথে পরিভাষাগত মূতার কোন সম্পর্ক নেই; শুধু শব্দটির মূলের প্রতি লক্ষ্য করেই এ দল দাবি করছে যে, আয়াত দ্বারা মূতার বৈধতা প্রমাণিত হচ্ছে।

প্রথম কথা এই যে, যখন অন্তত অন্য অর্থেরও সম্ভাবনা থাকবে (যদিও আমাদের মতে তা নির্দিষ্ট), তখন প্রমাণের পথ কি থাকতে পারে ?

দ্বিতীয় কথা এই যে, কোরআন পাক হারাম নারীদের কথা উল্লেখ করার পর বলেছেঃ তাদের ছাড়া স্বীয় অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে হালাল নারীদের তালাশ কর—এমতাবস্থায় যে, তোমরা 'বীর্যপাতকারী' না হও। অর্থাৎ শুধু কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা যেন না হয়। সাথে সাথে مُحْصِنِينَকথাটিও যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্রতার প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। মূতা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়। তাই এতে সন্তান লাভ, ঘর-সংসার পাতা এবং পবিত্রতা ও সাধুতা উদ্দেশ্য থাকে না। এ জন্যই যে নারীর সাথে মূতা করা হয়, যারা মূতাকে হালাল বলতে চায় তাকে ওয়ারিসী স্বত্বের অধিকারিণী স্ত্রী সাব্যস্ত করে না এবং প্রচলিত স্ত্রীদের মধ্যেও গণ্য করে না। যেহেতু এর উদ্দেশ্য শুধু কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, তাই পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই সাময়িকভাবে নতুন নতুন নারী ও পুরুষ খুঁজে বেড়ায়। এমতাবস্থায় মূতা সাধুতা ও পবিত্রতার সহায়ক নয় বরং দুশমন।

হিদায়ার গ্রন্থকার ইমাম মালেক এ সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি মৃতার বৈধতার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। হিদায়ার টীকাকার অন্যরা পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, এ ব্যাপারে হিদায়ার গ্রন্থকার ভুল করেছেন।

তবে কেউ কেউ দাবি করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) শেষ পর্যন্ত মূতার বৈধতার প্রবক্তা ছিলেন; অথচ আসল ব্যাপার তা নয়। ইমাম তিরমিযী (র) ما جاء فى نكاح المتعة অধ্যায়ের আওতায় দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদীসটি এইঃ

عن على بن ابى طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الا هلية زمن خيبر

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খয়বর যুদ্ধের সময় নারীদের সাথে মূতা করতে এবং পালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

হযরত আলী (রা)-এর এই হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফেও উদ্ধৃত রয়েছে। দ্বিতীয় হাদীসটি এইঃ

عن ابن عباس قال انما كانت المتعة في اول الاسلام حتى اذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم- قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام

—"হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ? মূতা ইসলামের প্রাথমিক যুগে বৈধ ছিল অতঃপর যখন – إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন তা রহিত হয়ে গেল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ এরপর শরীয়তসম্মত স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসী ছাড়া সর্বপ্রকার গুপ্তাঙ্গ ব্যবহার করাই হারাম হয়ে গেছে।

একথা সত্য যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কিছুদিন পর্যন্ত মৃতাকে জায়েয মনে করতেন। এরপর হযরত আলী (রা)-এর বোঝানোর ফলে (যেমন মুসলিম ১ম খণ্ড ৪৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে) এবং – إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ আয়াতদৃষ্টে তিনি পূর্বমত পরিত্যাগ করেন। যেমন, তিরমিযীর উপরোক্ত রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল।

আশ্চর্যের বিষয়, যে দলটি মূতার বৈধতার প্রবক্তা, তারা হযরত আলী (রা)-এর ভক্ত ও আনুগত্যের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে তাঁর বিরোধী।

فسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون

রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার কাযী আয়ায বর্ণনা করেন, খয়বর যুদ্ধের পূর্বে মূতা হালাল ছিল । খয়বর যুদ্ধের সময় হারাম করা হয়েছে। এরপর মক্কা বিজয়ের দিন হালাল করে দেওয়া হয় এবং তিনদিন পর চিরতরে হারাম ঘোষণা করা হয়।

এ ছাড়া এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ আল্লাহ্ তা'আলার এই ফরমান এত সুস্পষ্ট যে, এতে

দ্ব্যর্থতার কোন অবকাশ নেই। এ থেকে মৃতার অবৈধতা পরিষ্কার বোঝা যায়। এর বিপরীতে কোন কোন অখ্যাত কিরাআতের আশ্রয় গ্রহণ করা নিতান্তই ভুল।

পূর্বেও বলা হয়েছে استمتعتمথেকে পারিভাষিক মূতা বুঝে নেওয়ার কোন প্রমাণ নেই । এটা নিছক একটা সম্ভাবনা إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْএর অকাট্য বিষয়বস্তুর কিছুতেই বিপরীত হতে পারে না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, উভয় প্রমাণ শক্তিতে সমান, তবে বলা হবে যে, উভয় প্রমাণ বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী। যদি পরস্পর বিরোধিতা মেনে নেওয়া হয়, তবুও সুস্থ বিবেকের তাকীদ এই যে, অবৈধতা প্রতিপন্নকারীকে বৈধতা প্রতিপন্নকারীর বিপরীতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

মাসআলাঃ মৃতা বিয়ের মত 'মুয়াক্কাত' (সাময়িক) বিয়েও হারাম ও বাতিল। মুয়াক্কাত বিয়ে হলো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিয়ে করা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মূতা বিয়েতে 'মূতা' শব্দ বলা হয় এবং মুয়াক্কাত বিয়ে 'নিকাহ্' শব্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

— وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ অর্থাৎ পরস্পর মোহর নির্দিষ্ট করার পর নির্দিষ্ট মোহর অকাট্য হয়ে যায় না যে, তাতে কম-বেশি করা যাবে না; বরং স্বামী নিজের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট মোহর বৃদ্ধি করতে পারে এবং স্ত্রী ইচ্ছা করলে মনের খুশিতে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ মোহর ক্ষমাও করতে পারে। শব্দের ব্যাপকতাদৃষ্টে বোঝা যায় যে, স্ত্রী যদি মুয়াজ্জল (অবিলম্বে পরিশোধযোগ্য) মোহরকে বিলম্বে পরিশোধযোগ্য মোহরে রূপান্তরিত করে দেয় তবে তাও দুরস্ত এবং এতে কোন গোনাহ্ নেই।

— إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا আয়াতের শেষে এ বাক্যটি যুক্ত করে প্রথমত বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব খবর রাখেন। কেউ যদি উল্লিখিত বিধানসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে যদিও কোন বিচারক, শাসক বা মানুষ তা না জানে; কিন্তু আল্লাহ্ সব জানেন। তাঁকে সর্বাবস্থায় ভয় করতে থাকা উচিত।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, বর্ণিত সমস্ত বিধান হিকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন সূক্ষ্ম বিষয়কে হিকমত বলা হয়, যা প্রত্যেকের বোধগম্য নয়। আয়াতে বর্ণিত অবৈধতা ও বৈধতা সম্পর্কিত বিধানাবলীর নিগূঢ় তাৎপর্য কারও বোধগম্য হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় সেগুলো মেনে নেওয়া জরুবী। কেননা এ বিষয়ে আমাদের কারণ জানা না থাকলেও বিধানদাতা আল্লাহ্ তা'আলার তো জানা আছে, যিনি সর্বজ্ঞ ও রহস্যবিদ।

এ যুগের অনেক লেখাপড়া জানা মূর্খ লোক খোদায়ী বিধানের কারণ খুঁজে বেড়ায়। কোন কারণ জানা না গেলে, নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহর বিধানকে অনুপযোগী অথবা বর্তমান যুগের চাহিদার পরিপন্থী বলে এড়িয়ে যায়। আলোচ্য বাক্যে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়ে এবং বলা হয়েছেঃ তোমরা মূর্খ, আল্লাহ্ তা'আলা বিজ্ঞ। তোমরা অবুঝ, আল্লাহ্ তা'আলা রহস্যবিদ। সুতরাং নিজের বুদ্ধিমত্তাকে সত্যাসত্যের মাপকাঠি করো না।

(তাফসীরে মাআ'রিফুল কুরআন) [২১]

৫.৪ পরকীয়া (অন্যের স্ত্রী/স্বামীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক)

এই ব্যাপারে আল্লাহ্ ﷻকুরআনে এরশাদ করেছেন:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে।

(সূরা আল-মু'মিনুন: ৫-৭) [২২]

তাফসীর:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

অর্থাৎ যারা স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসীদের ছাড়া সব পরনারী থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারও সাথে কোন অবৈধ পন্থায় কামবাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে :

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ অর্থাৎ যারা শরীয়তের বিধি মোতাবেক স্ত্রী অথবা দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে জীবনের লক্ষ্য করা যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরূপ করলে সে তিরস্কারযোগ্য হবে না। والله اعلم

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রী অথবা শরীয়তসম্মত দাসীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূর্ণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোন পথ হালাল নয়; যেমন যিনা—তেমনি হারাম নারীকে বিবাহ করায়ও যিনার হুকুম বিদ্যমান। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েয ও নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা অথবা কোন পুরুষ, বালক অথবা জীব-জন্তুর সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা—এগুলো সব নিষিদ্ধ ও হারাম। অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে, استمناء باليد

অর্থাৎ হস্তমৈথুনও এর অন্তর্ভুক্ত।

(বয়ানুল কোরআন, কুরতুবী, বাহরে মুহীত)

(তাফসীরে মাআ'রিফুল কুরআন) [২১]

৫.৫ বিনা কারণে নারীদের সঙ্গে একান্তে সময় কাটানো বা নিকটতা স্থাপন

এই সম্পর্কে আল্লাহ্ ﷻবলেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

(সূরা আল-আহযাব:৫৯)[২৩]

এ আয়াত নারীদের পর্দা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়, যাতে পুরুষ-নারীর অবাধ মেলামেশা না হয় এবং হারাম সম্পর্কের সম্ভাবনা দূর হয়।

৫.৬ তথাকথিত প্রেম বা বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড সম্পর্ক

যদিও কুরআনে সরাসরি "বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড" শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, তবে এমন সম্পর্কের দিকে ধাবিত হওয়া, একান্তে সময় কাটানো, দৃষ্টির অপব্যবহার—এসবের নিষেধ এসেছে।

আল্লাহ্ বলেন:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

(সূরা আন-নূর:৩১)[২৪]

তাফসীর:

(নারীদের পর্দা সম্পর্কিত ষষ্ঠ নির্দেশ) আপনি মুসলমান পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে (অর্থাৎ যে অঙ্গের প্রতি সর্বাবস্থায় দৃষ্টিপাত করা নাজায়েয, সেই অঙ্গের প্রতি যেন মোটেই দৃষ্টিপাত না করে এবং যে অঙ্গ এমনিতে দেখা জায়েয, কিন্তু কামভাব সহকারে দেখা নাজায়েয, সেই অঙ্গ যেন কামভাব সহকারে না দেখে) এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে (অর্থাৎ অবৈধ পাত্রে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ না করে। ব্যভিচার ও পুংমৈথুন সব এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্রতার কারণ। (এর খেলাফ করলে, হয় ব্যভিচার, না হয় ব্যভিচারের ভূমিকায় লিপ্ত হবে) নিশ্চয় আল্লাহ অবহিত আছেন যা কিছু তারা করে। (সুতরাং বিরুদ্ধাচরণকারীরা শাস্তিযোগ্য হবে) আর (এমনিভাবে) মুসলমান নারীদেরকে বলে দিন । তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে। (অর্থাৎ যে অঙ্গের প্রতি সর্বাবস্থায় দৃষ্টিপাত করা নাজায়েয সেই অঙ্গের প্রতি যেন মোটেই দৃষ্টিপাত না করে এবং যে অঙ্গ এমনিতে দেখা জায়েয, কিন্তু কামভাব সহকারে দেখা নাজায়েয, সেই অঙ্গ যেন কামভাব সহকারে না দেখে) এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। (ব্যভিচার, পারস্পরিক কোলাকুলি সব এর অন্তর্ভুক্ত) এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্য (অর্থাৎ সৌন্দর্যের স্থানসমূহ) প্রদর্শন না করে। ('সৌন্দর্য বলে গহনা; যেমন কংকন, চুরি, পায়ের অলংকার, বাজুবন্দ, বেড়ী, ঝুমুর, পট্টি, বালি ইত্যাদি এবং সৌন্দর্যের স্থান' বলে হাত, পায়ের গোছা, বাহু, গ্রীবা, মাথা, বক্ষ, কান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এসব স্থান সবার কাছ থেকে গোপন রাখবে, সেই ব্যতিক্রমদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করে, যা পরে বর্ণিত হবে। এসব স্থানকে বেগানাদের কাছ থেকে গোপন রাখা ওয়াজিব এবং মাহরাম ব্যক্তিদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয। পরে এ কথা বর্ণিত হবে। অতএব দেহের অন্যান্য অঙ্গ—যেমন পিঠ, পেট ইত্যাদি আবৃত রাখাও আয়াতদৃষ্টে ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ, এগুলো মাহরামের সামনেও খোলা জায়েয নয়। সারকথা এই যে, নারীরা যেন তাদের আপাদমস্তক আবৃত রাখে। উপরোক্ত দু'টি ব্যতিক্রমের প্রথমটি প্রয়োজনের খাতিরে ব্যক্ত হয়েছে। কারণ, দৈনন্দিন কাজকর্মে যেসব অঙ্গ খোলার প্রয়োজন হয়, সেগুলোকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর বিবরণ এরূপঃ) কিন্তু যা (অর্থাৎ যে সৌন্দর্যের স্থান সাধারণত) খোলা (ই-) থাকে (যা আবৃত করার মধ্যে সার্বক্ষণিক অসুবিধা রয়েছে। এরূপ সৌন্দর্যের স্থান বলে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এবং বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী পদযুগলও বুঝানো হয়েছে। কেননা মুখমণ্ডল তো প্রকৃতিগতভাবেই সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও কোন কোন সাজসজ্জা এতে করা হয়; যেমন সুরমা ইত্যাদি। হাতের তালু, অঙ্গুলি মেহেদী ও আংটির স্থান। পদযুগল, আংটি ও মেহেদীর স্থান। এসব স্থান না খুলে কাজকর্ম সম্ভবপর নয় বলেই এগুলোকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাদীসে -ماظهرএর তফসীরে মুখমণ্ডল ও দুই হাতের তালু উল্লেখ করা হয়েছে। ফিকহবিদগণ কারণের ভিত্তিতে অনুমান করে পদযুগলকে

এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন) এবং (বিশেষ করে তারা যেন খুব যত্ন সহকারে মাথা ও বক্ষ আবৃত করে এবং) তাদের ওড়না (যা মাথা আবৃত করার জন্য ব্যবহৃত হয়) বক্ষদেশে ফেলে রাখে (যদিও বক্ষদেশ জামা দ্বারা আবৃত হয়ে যায়; কিন্তু প্রায়ই জামার বোতাম খোলা থাকে এবং বক্ষের আকৃতি জামা সত্ত্বেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন আছে। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম বর্ণিত হচ্ছে। এতে মাহরাম পুরুষদেরকে পর্দার উল্লিখিত বিধান থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে।) এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে (অর্থাৎ সৌন্দর্যের উল্লিখিত স্থানসমূহকে কারও কাছে) প্রকাশ না করে; কিন্তু স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, (সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়) ভ্রাতা, (চাচাত, মামাত ইত্যাদি ভ্রাতা নয়) ভ্রাতুষ্পুত্র, (সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া) ভগ্নিপুত্র, (চাচাত, খালাত বোনদের পুত্র নয়) নিজেদের (ধর্মে শরীক) স্ত্রীলোক (অর্থাৎ মুসলমান স্ত্রীলোক। কাফির স্ত্রীলোক বেগানা পুরুষের মতই) বাঁদী (কাফির হলেও কেননা পুরুষ ক্রীতদাসের বিধান ইমাম আবূ হানীফার মতে বেগানা পুরুষের মত। তার কাছেও পর্দা ওয়াজিব), এমন পুরুষ যারা (শুধু পানাহারের জন্য) সেবক (হিসাবে থাকে এবং ইন্দ্রিয় সঠিক না হওয়ার কারণে) মহিলাদের প্রতি উৎসাহী নয়।[বিষেশভাবে এদের কথা বলার কারণ এই যে, তখন এ ধরনের লোকই বিদ্যমান ছিল।(দুরেরে-মনসূর) প্রত্যেক নির্বোধ ব্যক্তির বিধান তাই। কাজেই এই বিধানটি নির্বোধ হওয়ার উপর ভিত্তিশীল, সেবক হওয়ার উপর নয়। কিন্তু তখন যারা ছিল, তারা তাই তাবে’ সেবক উল্লেখ করা হয়েছে। যারা বোধশক্তির অধিকারী, তারা বৃদ্ধ অথবা লিঙ্গকর্তিত হলেও বেগানা পুরুষ। তাদের পর্দা ওয়াজিব। অথবা এমন বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে এখনও অজ্ঞ (অর্থাৎ যেসব বালক এখনও পর্যন্ত সাবালকত্বের নিকটবর্তী হয়নি এবং কামভাব সম্পর্কে কিছুই জানে না। উপরোক্ত সবার সামনে মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়ের তালু উল্লিখিত স্থানসমূহ প্রকাশ জায়েয ; অর্থাৎ মাথা ও বক্ষ। স্বামীর সামনে কোন অঙ্গ আবৃত রাখা ওয়াজিব নয়। তবে অঙ্গকে দেখা অনুত্তম।

منه ولم ير مني ذالك الموضع آورده المشكواة وروى بقي بن مخلد وابن عدى عن ابن عباس مرفوعا اذا جـامـع زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذالك يورث العمى قال ابن صـلاح جيد الإسناد كذا في الجامع الصغير

এবং (পর্দার প্রতি এতটুকু যত্নবান হতে পারে চলার সময়) সজোরে পদক্ষেপ করবে না, যাতে তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ হয়ে পড়ে (অর্থাৎ অলংকারাদির আওয়াজ বেগানা পুরুষদের কানে পৌছে যায়)। হে মুসলমানগণ (এসব বিধানের ক্ষেত্রে তোমাদের দ্বারা ত্রুটি হয়ে গেছে, তজ্জন্য) তোমরা সবাই আল্লাহ্ তা’আলার সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও (নতুবা গুনাহ্ পূর্ণ সফলতার পরিপন্থী হয়ে যাবে)।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى

يغضوا— لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

শব্দটি غضথেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কম করা এবং নত করা।—(রাগিব) দৃষ্টি নত রাখার অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেওয়া, যার প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। ইবনে কাসীর ও ইবনে হাইয়ান এ তফসীরই করেছেন। বেগানা নারীর প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং নিয়ত ছাড়াই দেখা মাকরুহ – এ বিধানটি এর অন্তর্ভুক্ত। কোন নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও এর মধ্যে দাখিল(চিকিৎসা ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত)। এ ছাড়া কারও গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উঁকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত।

وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এতে ব্যভিচার, পুংমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ—যাতে কামভাব পূর্ণ হয়, হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কামপ্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার।

এ দু'টিকে স্পষ্টও উল্লেখ করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী হারাম ভূমিকাসমূহ—যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর (র) হযরত ওবায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, كل ما عصى الله به فهو كبيرة وقد ذكر الطرفينঅর্থাৎ যদ্দারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ, তাই কবীরা। কিন্তু আয়াতে তার দুই প্রান্ত--সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। তাবারানী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ

النظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه

—দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি বিষাক্ত শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্ত্বেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আমি তার পরিবর্তে তাকে সুদৃঢ় ঈমান দান করব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে। (তাফসীরে মাআ'রিফুল কুরআন) [২১]

উপসংহার: কুরাআন একাধিক আয়াতে হারাম সম্পর্কের ভয়াবহতা তুলে ধরেছে এবং মুসলিম সমাজকে সতর্ক করেছে। যেসব সম্পর্ক নৈতিকতা, পর্দা, এবং বৈধতা লঙ্ঘন করে—তা হারাম এবং ভয়াবহ গুনাহ। মুসলমানদের উচিত কুরআনের এই নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করে নিজেদের চরিত্র ও সমাজকে শুদ্ধ রাখা।

অধ্যায় ৬ : হাদীসের আলোকে হারাম রিলেশনশিপ

নিচে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন হারাম সম্পর্ক নিয়ে হাদীস থেকে প্রমাণসহ ব্যাখ্যা দেওয়া হলো।

৬.১ ব্যভিচার

হাদীস:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ ". وَعَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ إِلاَّ النُّهْبَةَ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন ব্যভিচারী মু’মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না এবং কোন মদ্যপায়ী মু’মিন অবস্থায় মদ পান করে না। কোন চোর মু’মিন অবস্থায় চুরি করে না। কোন লুটতরাজকারী মু’মিন অবস্থায় এরূপ লুটতরাজ করে না যে, যখন সে লুটতরাজ করে তখন তার প্রতি লোকজন চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।সা‘ঈদ ও আবূ সালামা (রাঃ) আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে অনুরূপ বর্ণিত, তবে তাতে লুটতরাজের উল্লেখ নেই। ফিরাবরী (রহঃ) বলেন, আমি আবূ জা’ফর (রহ)-এর লেখা পান্ডুলিপিতে পেয়েছি যে, আবূ ‘আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (রহঃ) বলেন, এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল, তার হতে ঈমানের নূর ছিনিয়ে নেয়া হয়। (সহীহ বুখারী: ২৪৭৫) [২৫]

৬.২ সমকামিতা

হাদীস:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ .

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা কাউকে যদি লুত গোত্রের মতই কুকর্মে লিপ্ত দেখতে পাও তাহলে কর্তা ও যার সঙ্গে করা হয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা করো।

(সুনানে আবু দাউদ হাদিস: ৪৪৬২)[২৬]

৬.৩ বিবাহিত নারীর সাথে সম্পর্ক

হাদীস:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ " الْحَمْوُ الْمَوْتُ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ " . وَمَعْنَى قَوْلِهِ " الْحَمْوُ " . يُقَالُ هُوَ أَخُو الزَّوْجِ كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا .

উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাবধান! মহিলাদের সাথে তোমরা কেউ অবাধে দেখা-সাক্ষাৎ করবে না। আনসার সম্প্রদায়ের এক লোক বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেনঃ সে তো মৃত্যু (সমতুল্য)। — সহীহ, গায়াতুল মারাম (**১৮১**), বুখারী, মুসলিম

উমার, জাবির ও আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবু ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। অবাধে স্ত্রীলোকদের সাথে মেলা-মেশার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একইরকম হাদীস আরও আছে। তিনি বলেনঃ 'একজন স্ত্রীলোকের সাথে একজন পুরুষ একাকী থাকলে তাদের মধ্যে শাইতান তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে যোগ দেয়''।

''হামউ" অর্থ হচ্ছে স্বামীর ভাই'। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাবীর সাথে দেবরকেও একাকী থাকতে নিষেধ করেছেন।

(জামে' আত তিরমিযি: **১১৭১**)[২৭]

৬.৪ গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক

হাদীস:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا فَقَالَ " أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلاَ يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلاَ يُسْتَشْهَدُ أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, 'জাবিয়া' (সিরিয়ার অন্তর্গত) নামক জায়গায় উমার (রাঃ) আমাদের সামনে খুতবাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বলেনঃ হে উপস্থিত জনতা! যেভাবে আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়াতেন, সেভাবে তোমাদের মাঝে আমিও দাঁড়িয়েছি। তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি (তাদের জমানা শ্রেষ্ঠ জমানা), তারপর তাদের পরবর্তী জমানা, তারপর তাদের পরবর্তী জমানা, তারপর মিথ্যাচারের বিস্তার ঘটবে। এমনকি কাউকে শপথ করতে না বলা হলেও সে শপথ করবে, আর সাক্ষ্য প্রদান করতে না বলা হলেও সাক্ষ্য প্রদান করবে। সাবধান! কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হলে সেখানে অবশ্যই তৃতীয়জন হিসাবে শাইতান অবস্থান করে (এবং পাপাচারে প্ররোচনা দেয়)। তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস কর। বিচ্ছিন্নতা হতে সাবধান থেকো। কেননা, শাইতান বিচ্ছিন্নজনের সাথে থাকে এবং সে দুজন হতে অনেক দুরে অবস্থান করে। যে লোক জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে উত্তম জায়াগার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে (মুসলিম সমাজে)। যার সৎ আমল তাকে আনন্দিত করে এবং বদ্ আমল কষ্ট দেয় সেই হলো প্রকৃত ঈমানদার।

(জামে' আত তিরমিযি: ২১৬৫)[২৮]

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ. حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ ".

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বানী আদামের জন্য যিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের জিনা হলো দেখা, জিহ্বার জিনা হলো কথা বলা, কুপ্রবৃত্তি কামনা ও খাহেশ সৃষ্টি করা এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে।

(সহীহ বুখারী: ৬২৪৩)[২৯]

অধ্যায় ৭ : সমাজে হারাম সম্পর্ক ছড়িয়ে পড়ার কারণসমূহ

- ❖ আল্লাহভীতি ও পরকালের ভয় না থাকা
- ❖ ইসলামী শিক্ষার অভাব
- ❖ অভিভাবক ও পরিবারে অনুশাসনের দুর্বলতা
- ❖ বিয়ে বিলম্বিত হওয়া ও বিয়েকে কঠিন করে তোলা
- ❖ সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার
- ❖ অশ্লীল সংস্কৃতির সহজলভ্যতা

অধ্যায় ৮ : হারাম সম্পর্কের পারিবারিক ও সামাজিক পরিণতি

হারাম সম্পর্ক শুধু একটি ব্যক্তিগত গুনাহ নয় বরং একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। একজনের ব্যক্তিগত হারাম সম্পর্কের প্রভাব পড়ে গোটা পরিবারে, সমাজে এবং জাতির ভবিষ্যতের ওপর। ইসলাম পরিবার ও সমাজকে একটি নিরাপদ, শান্তিময় এবং ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশে গড়ে তোলার নির্দেশ দেয়। হারাম সম্পর্ক এই কাঠামোকে ভেঙে চুরমার করে দেয়।

৮.১ পারিবারিক পরিণতি

৮.১.১ বিশ্বাস ও ভালোবাসার ভাঙন

একটি পরিবারের মূল ভিত্তি হল পারস্পরিক বিশ্বাস। যখন স্বামী বা স্ত্রী হারাম সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তখন সেই ভিত্তি ধসে পড়ে। সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ঘৃণা জন্ম নেয়।

৮.১.২ বিবাহবিচ্ছেদ ও সংসার ভেঙে যাওয়া

পরকীয়া বা প্রেমের সম্পর্কের কারণে অনেক সংসার ভেঙে যায়। এতে করে সন্তানের ভবিষ্যৎ, নারীর সম্মান এবং পারিবারিক স্থিতিশীলতা ধ্বংস হয়।

৮.১.৩ সন্তানদের নৈতিক অবক্ষয়

হারাম সম্পর্কের কারণে সন্তানরা দুটি বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়:

এক, তারা অনৈতিকতা শিখে ফেলে।

দুই, পরিবারের ভাঙনের কারণে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

৮.২ সামাজিক পরিণতি

৮.২.১ অশ্লীলতার বিস্তার

যখন হারাম সম্পর্ক সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, তখন সমাজে অশ্লীলতা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এতে করে লজ্জাশীলতা ও ধর্মীয় অনুশাসন বিলুপ্ত হয়।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا .

আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেনঃ হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি।

(সুনানে ইবনে মাজাহ:৪০১৯)[৩০]

৮.২.২ ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি

হারাম সম্পর্কের আসক্তি বহু অপরাধের জন্ম দেয়। প্রেমের ছলে প্রতারণা, ধর্ষণ, ব্ল্যাকমেইলিং ও এমনকি হত্যা পর্যন্ত ঘটে।

৮.২..৩ ব্যভিচারের সন্তান ও পরিবারহীন প্রজন্ম

যিনার ফলে জন্ম নেয়া সন্তানরা সামাজিক পরিচয়, স্নেহ ও নিরাপত্তাহীন পরিবেশে বেড়ে ওঠে। এটি সমাজে অপরাধপ্রবণতা বাড়ায় এবং 'পারিবারিক বন্ধন' ধ্বংস কবিবাহ ব্যবস্থার প্রতি অনীহা

৮.২.৩ বিবাহ ব্যবস্থার প্রতি অনীহা

যখন হারাম সম্পর্ক সহজলভ্য হয়, তখন যুবসমাজ বৈধ বিয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এতে করে বিবাহ বিলম্বিত হয় এবং সমাজে ব্যভিচার বাড়ে।

৮.৩ অর্থনৈতিক ও আইনি প্রভাব

৮.৩.১ খরচের অপচয়: প্রেম-সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে অপচয়, উপহার ও অবৈধ কাজের খরচ বেড়ে যায়।

৮.৩.২ আইনি জটিলতা: বিবাহবহির্ভূত সন্তান, ভরণ-পোষণ, তালাক ও মামলার পরিমাণ বেড়ে যায়।

৮.৪ জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিণতি

একটি জাতি যদি হারাম সম্পর্ককে সামাজিকভাবে মেনে নেয়, তাহলে ধীরে ধীরে সে জাতির মূল্যবোধ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যায়। পশ্চিমা দেশগুলো তার উদাহরণ—যেখানে পরিবার ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে।

অধ্যায় ৯ : ইসলামে হারাম সম্পর্কের বিধান: কারণ ও উদ্দেশ্য

৯.১ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

ইসলামে কোনো হারাম কাজ বা সম্পর্ক করার মানে হলো আল্লাহর নির্দেশনা অমান্য করা। একজন মুসলিমের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, এবং এজন্য তাকে সব ধরনের হারাম সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতে হবে।

৯.২ মানুষের আত্মিক এবং নৈতিক শুদ্ধতা রক্ষা

ইসলামে আত্মিক শুদ্ধতা এবং নৈতিক উন্নতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হারাম সম্পর্ক যেমন যিনা (অবৈধ যৌন সম্পর্ক), পরকীয়া, সমকামিতা, ইত্যাদি ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস এবং নৈতিকতা ধ্বংস করে। এসব সম্পর্ক মানুষের মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতার জন্য ক্ষতিকর।

৯.৩ পারিবারিক সম্পর্কের সুরক্ষা

ইসলামে পারিবারিক সম্পর্কের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। একটি পরিবার হলো সমাজের মৌলিক একক। হারাম সম্পর্ক, যেমন যিনা বা পরকীয়া, পারিবারিক শৃঙ্খলা ও বিশ্বাসকে ধ্বংস করে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী, একজন পুরুষ ও নারী একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল এবং তাদের সম্পর্ক আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী শুদ্ধ হওয়া উচিত। এই ধরনের সম্পর্কগুলি পারিবারিক জীবনের ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৯.৪ সামাজিক শৃঙ্খলা এবং শান্তি বজায় রাখা

হারাম সম্পর্ক সমাজে অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। যিনা বা পরকীয়া সম্পর্কের ফলে সমাজে বিশ্বাসের অভাব, অবিশ্বাস এবং পারিবারিক অশান্তি বাড়ে। ইসলামে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য হারাম সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৯.৫ যৌন সম্পর্কের সীমা নির্ধারণ

ইসলামে যৌন সম্পর্কের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মাবলী রয়েছে। বিবাহিত জীবন ছাড়া যৌন সম্পর্ককে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, কারণ এটা মানুষকে আত্মসামাজিক দায়িত্ব, সতীত্ব এবং শৃঙ্খলা শিখিয়ে দেয়।

৯.৬ স্বাস্থ্যের রক্ষা

হারাম সম্পর্কের মাধ্যমে রোগবিস্তারও হতে পারে, বিশেষত যিনা বা পরকীয়া সম্পর্কের মাধ্যমে যৌনরোগের বিস্তার ঘটতে পারে। ইসলামে স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এই ধরনের সম্পর্ক ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

অধ্যায় ১০ : হারাম সম্পর্ক থেকে বাঁচার উপায় ও ইসলামের দিকনির্দেশনা

হারাম সম্পর্কের ঝুঁকি মোকাবেলা করা ও সেগুলি থেকে দূরে থাকার উপায় ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের দৃষ্টিতে, একজন মুসলিমের মূল লক্ষ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধতার দিকে অগ্রসর হওয়া। হারাম সম্পর্কের অভ্যাস কেবল ব্যক্তির আত্মিক অবক্ষয় ঘটায় না, বরং এটি সামাজিক শৃঙ্খলা এবং পারিবারিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে। তাই ইসলামে হারাম সম্পর্ক থেকে বাঁচার জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

১০.১ আল্লাহর ভীতি (তাকওয়া)

হারাম সম্পর্ক থেকে বাঁচতে প্রথম ও প্রধান উপায় হল আল্লাহর ভীতি বা তাকওয়া অর্জন। ইসলামে আল্লাহর স্মরণ, তাঁর আদেশ মান্য করা এবং পরকালের ভয় থেকে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা সৎ জীবনযাপনের মূল মন্ত্র। একবার একজন মুসলিম আল্লাহকে ভয় করতে শুরু করলে, সে যে কোনো ধরনের ভুল থেকে সরে যাবে, বিশেষ করে এমন সম্পর্কের পথ থেকে যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

১০.২ দৃষ্টির হেফাজত

একজন মুসলিমের প্রথম বাধা হওয়া উচিত তার দৃষ্টি। যখন চোখের দিকে অবৈধ দৃষ্টি পড়ে, তা ধীরে ধীরে হৃদয়ে ক্ষতি করতে শুরু করে। ইসলাম চক্ষু সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, কারণ অবৈধ সম্পর্কের সূচনা প্রায়শই চোখের দ্বারা হয়। তাই চোখের হেফাজত করা হারাম সম্পর্ক থেকে দূরে থাকার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

আল্লাহ্ বলেন:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿۳۰﴾

মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।

(সুরা আন নুর:৩০)[৩১]

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

(সূরা আন-নূর:৩১)[২৪]

এই আয়াত গুলোতে নারী পুরুষ উভয়কেই ই নজর হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১০.৩ পর্দার বিধান মেনে চলা

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত

কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

(সূরা আন-নূর:৩১)[২৪]

পর্দা বা সঠিক আচ্ছাদনের বিধান ইসলামের একটি অপরিহার্য দিক। নারী ও পুরুষের মাঝে পর্দা মেনে চলা শারীরিক এবং মানসিকভাবে পরস্পরের মধ্যে সীমাবদ্ধতা স্থাপন করে, যা হারাম সম্পর্কের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। পুরুষ ও নারীদের সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পর্দা অনুসরণ করা অপরিহার্য।

১০.৪ বিবাহকে সহজ করা

হাদিস:

عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلٰى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّه" أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّه" لَه" وِجَاءٌ.

'আবদুল্লাহ্ ইব্নু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) – এর সঙ্গে আমরা কতক যুবক ছিলাম; আর আমাদের কোন কিছু ছিল না। এই হালতে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন। হে যুবক সম্প্রদায় [৩]! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে এবং যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সাওম পালন করে। কেননা, সাওম তার যৌনতাকে দমন করবে।

(সহীহ বুখার: ৫০৬৬)[৩২]

ইসলামে বিবাহকে একটি অত্যন্ত পবিত্র সম্পর্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমান সমাজে হারাম সম্পর্কের প্রবণতা বাড়ানোর অন্যতম কারণ হল বিয়ের দেরি বা কঠিন হয়ে যাওয়া। ইসলামী দিকনির্দেশনায়, বিবাহকে সহজ করা এবং যথাসম্ভব তরুণদের জন্য এটা গ্রহণযোগ্য ও সহজলভ্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বীকৃত বিবাহের মাধ্যমে একটি সুস্থ ও বৈধ সম্পর্কের পথ খোলা থাকে, যা হারাম সম্পর্কের বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

১০.৫ নৈতিক শিক্ষা ও পরিবারের দায়িত্ব

আল্লাহ্ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴿٦﴾

মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।

(সূরা তাহরীম: ৬)[৩৩]

একটি পরিবার তার সন্তানদের সঠিক নৈতিক শিক্ষা দিয়ে তাদের হারাম সম্পর্ক থেকে বাঁচাতে পারে। পরিবারের অভিভাবকদের জন্য এটা একধরনের কর্তব্য, যাতে তারা তাদের সন্তানদের ইসলামী শিক্ষায় পবিত্রতা, সম্মান এবং পর্দা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সন্তানদের মনের গভীরে ধর্মীয় মূল্যবোধ, তাকওয়া এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস তৈরি করা তাদেরকে হারাম সম্পর্ক থেকে বিরত রাখে।

১০.৬ সমাবেশ ও পরিবেশের গুরুত্ব

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا .

আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেনঃ হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি।

(সুনানে ইবনে মাজাহ:৪০১৯)[৩৪]

হারাম সম্পর্ক থেকে বাঁচার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল একটি ইসলামী পরিবেশ গঠন করা। যখন সমাজে অশ্লীলতা বা হারাম সম্পর্কগুলোর প্রবণতা বেড়ে যায়, তখন পরিবেশই মানুষকে প্রভাবিত করে। ইসলামী সমাজে পরিপূর্ণতা এবং নৈতিকতার সাথে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে মানুষের মধ্যে এই ধরনের সম্পর্কের প্রতি আগ্রহ কমে যায়।

মুসলমানদের উচিত, সঠিক সমাজে বাস করা যেখানে মানুষের মধ্যে অসত্য, মিথ্যা, অশ্লীলতা এবং হারাম সম্পর্কের প্রবণতা কম থাকবে। ইসলামী সামাজিক নীতি অনুসরণ করলে, মানুষের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক এবং পরিবারের ভেতর শান্তি বজায় থাকে। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা এবং সহানুভূতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

১০.৭ সোশ্যাল মিডিয়ায় সচেতনতা ও সীমাবদ্ধতা

বর্তমানে হারাম সম্পর্কের একটি বড় উৎস হলো ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি। তাই এসব মাধ্যম ব্যবহারে সচেতনতা জরুরি।

প্রতিকারমূলক করণীয়:

- ✓ অপ্রয়োজনে অপরিচিতের সঙ্গে চ্যাট না করা
- ✓ পবিত্র/হালাল কনটেন্ট দেখা
- ✓ অশ্লীল ছবি/ভিডিও ব্লক করা
- ✓ ইসলামি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার

১০.৮ উপসংহার

হারাম সম্পর্ক থেকে বাঁচার জন্য ইসলামে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহর ভীতি, দৃষ্টি ও পর্দার সুরক্ষা, বিবাহকে সহজ করা, পরিবারের নৈতিক শিক্ষা, এবং সমাজের সঠিক পরিবেশ গঠন—এসব উপায়ের মাধ্যমে আমরা এই ধ্বংসাত্মক সম্পর্কগুলি থেকে নিজেদের এবং সমাজকে রক্ষা করতে পারি। ইসলামী জীবনধারা অনুসরণ করলে, একমাত্র সত্যিকারের সুখ, শান্তি এবং পরকালীন মুক্তি সম্ভব।

অধ্যায় ১১: হারাম সম্পর্কের শাস্তি এবং ইসলামী বিচার ব্যবস্থা

১১.১ ভূমিকা

ইসলামে যেকোনো হারাম কাজের শাস্তি রয়েছে এবং ইসলামিক আইন অনুযায়ী এসব শাস্তি অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে প্রযোজ্য। হারাম সম্পর্কের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান যেমন কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী ফিকাহ-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে শুধু একক ব্যক্তির নৈতিকতা নয়, পুরো সমাজের শৃঙ্খলাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হারাম সম্পর্ক সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশ্লীলতার সৃষ্টি করে, তাই ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় এসবের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

১১.২ হারাম সম্পর্কের শাস্তি: কুরআন ও হাদীসের আলোকে

১১.২.১ যিনা (ব্যভিচার) ও শাস্তি

ইসলামের দৃষ্টিতে যিনা (অবৈধ যৌন সম্পর্ক) অত্যন্ত গুরুতর গুনাহ এবং এর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। কুরআনে যিনা করার শাস্তি হিসেবে ১০০ দৃষ্টান্তে শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। ইসলামিক শরিয়াহ অনুযায়ী, অবিবাহিত ব্যক্তির জন্য ১০০ কোড়া মারার (শাস্তি) বিধান আছে এবং বিবাহিত ব্যক্তি যদি যিনার সাথে লিপ্ত হন, তাদের জন্য শাস্তি হ'ল পাথর মেরে হত্যা করা। যদিও আধুনিক মুসলিম দেশে এই শাস্তি অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় না, তবুও ইসলামে এর বিধান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেন:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴿٢﴾

ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর কারণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

(সূরা আন-নূর: ২)[৩৫]

হাদিস:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ .

আবূ তাহির ও হারমালাহ্ ইবনু ইয়াহইয়াহ্ (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "উমর ইবনু খাত্তাব (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিম্বারের উপর বসা অবস্থায় বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন এবং তার উপর কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়ের মধ্যে (آيَةُ الرَّجْمِ ব্যভিচারের জন্য পাথর নিক্ষেপের আয়াত) রয়েছে। তা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। সুতরাং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যভিচারের জন্য রজম করার হুকুম বাস্তবায়ন করেছেন। তার পরবর্তী সময়ে আমরাও (ব্যভিচারের জন্য) রজমের হুকুম বাস্তবায়িত করেছি। আমি ভয় করছি যে, দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর কেউ এ কথা হয়তো বলবে যে, আমরা আল্লাহর কিতাবে (ব্যভিচারের শাস্তি) রজমের নির্দেশ পাই না। তখন আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত এ ফরয কাজটি পরিত্যাগ করে তারা মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করে

ফেলবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর কিতাবে বিবাহিত নর-নারীর ব্যভিচারের শাস্তি) رجمপাথর নিক্ষেপ করে হত্যা) এর হুকুম সাব্যস্ত। যখন সাক্ষ্য দ্বারা তা প্রমাণিত হয়, কিংবা গর্ভবতী হয়, অথবা সে নিজে স্বীকার করে।(সহিহ মুসলিম:৪৩১০)[৩৬]

১১.২.২ সমকামিতার শাস্তি

ইসলাম সমকামিতা বা সমলিঙ্গের সম্পর্ককে সম্পূর্ণভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। কুরআন ও হাদীসে এই সম্পর্কে স্পষ্টভাবে শাস্তি বলা হয়েছে। লূত (আঃ)-এর যুগে আল্লাহ সমকামী সম্পর্কের জন্য জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন। ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী, সমকামিতার জন্য শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড বা কঠোর দণ্ড।

আল্লাহ্ বলেন:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ﴿٨٢﴾

“অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, এরপর যখন আমার সিদ্ধান্ত কার্যকর হল, তখন আমি জনপদের উপরিভাগ নিচে এবং নিম্নভাগ উপরে উঠালাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর-পাথর বর্ষণ করলাম।"

(সুরা হুদ: ৮২)[৩৭]

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু সাল্লাম বলেছেন,

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلَاثًا –(حسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند)

"যে ব্যক্তি লুতের সম্প্রদায়ের কাজে (সমকামে) লিপ্ত হবে তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত।যে ব্যক্তি লুতের সম্প্রদায়ের কাজে (সমকামে) লিপ্ত হবে তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত।" এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন। (মুসনাদ আহমদ ২৯১৫)[৩৮]

ইসলামের ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী সমকামিতার শাস্তি হল, মৃত্যুদণ্ড:

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যাদেরকে তোমরা লুতের সম্প্রদায়ের কাজে (সমকামে) লিপ্ত দেখবে তাদের উভয়কেই হত্যা করো।

(তিরমিজি: ৪/৫৭; আবু দাউদ: ৪/২৬৯; ইবনে মাজা: ২/৮৫৬)[৩৯]

প্রচলিত আইনে সমকামিতার শাস্তি:

অধিকাংশ সমাজে এবং সরকার ব্যবস্থায় সমকামী আচরণকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ: বাংলাদেশ (দশ বছরের থেকে শুরু করে আমরণ সশ্রম কারাদণ্ড) সহ দক্ষিণ এশিয়ার ৬ টি দেশের সংবিধানে ৩৭৭ ধারা এবং ১৯টি দেশে সমপর্যায়ের ধারা এবং সম্পূরক ধারা মোতাবেক সমকামিতা ও পশুকামিতা প্রকৃতি বিরোধী যৌনাচার হিসেবে শাস্তিযোগ্য ও দণ্ডনীয় ফৌজদারি অপরাধ।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা মোতাবেক পায়ু মৈথুন শাস্তিযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ, যার শাস্তি দশ বছর থেকে শুরু করে আজীবন কারাদণ্ড এবং সাথে জরিমানাও হতে পারে। এ আইনে বলা হয়েছে:

৩৭৭. প্রকৃতিবিরুদ্ধ অপরাধ: কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কোন পুরুষ, নারী বা পশু প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যৌন সঙ্গম করে, তবে তাকে আজীবন কারাদণ্ড দেয়া হবে, অথবা বর্ণনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কালের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে যা দশ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে, এবং এর সাথে নির্দিষ্ট অঙ্কের আর্থিক জরিমানাও দিতে হবে।

ব্যাখ্যা: ধারা অনুযায়ী অপরাধ প্রমাণে যৌনসংগমের প্রয়োজনীয় প্রমাণ হিসেবে লিঙ্গ প্রবেশের প্রমাণ যথেষ্ট হবে।

৩৭৭ ধারার ব্যাখ্যায় পায়ু সঙ্গম জনিত যে কোন যৌথ যৌন কার্যকলাপকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একারণে, পরস্পর সম্মতিক্রমে বিপরীতকামী মুখকাম ও পায়ু মৈথুনও উক্ত আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। [মুক্ত বিশ্বকোষ, বাংলাদেশে সমকামীদের অধিকার]

১১.২.৩ পরকীয়া (অবৈধ সম্পর্কের শাস্তি)

পরকীয়া বা অবৈধ সম্পর্ক একটি গুরুতর অপরাধ। ইসলামে এটি যিনার অন্তর্গত এবং এই সম্পর্কের শাস্তি একই রকম শাস্তি, যা যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তির আওতায় পড়ে। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় এ ধরনের সম্পর্কের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

১১.৩ ইসলামী বিচার ব্যবস্থা: শাস্তির নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা একটি সুসংগঠিত কাঠামো, যেখানে শাস্তির ক্ষেত্রে একাধিক ধাপ রয়েছে এবং শাস্তি দেওয়ার আগে সঠিক প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়। ইসলামিক শাস্তির বিধান প্রমাণ ও সাক্ষীর ওপর ভিত্তি করে বাস্তবায়ন করা হয়। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিচার ব্যবস্থার দিক তুলে ধরা হলো:

১১.৩.১ সাক্ষী ও প্রমাণের গুরুত্ব

ইসলামে যে কোনো অপরাধের শাস্তি কার্যকর করার জন্য প্রমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যিনা বা পরকীয়ার মতো অপরাধে প্রমাণ হিসাবে চারজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী প্রয়োজন। যদি এই প্রমাণাদি নিশ্চিত না হয়, তবে অপরাধীর বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান করা হয় না।

১১.৩.২ ইসলামিক আদালত ও বিচারক

ইসলামে বিচারক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন বিচারককে তার বিচারকাজের জন্য মহান আল্লাহর সামনে দায়ী থাকতে হয় এবং তাকে ন্যায় ও শুদ্ধতার ভিত্তিতে বিচার করতে হয়। ইসলামী আদালত যেকোনো ধরনের হারাম সম্পর্কের শাস্তি বাস্তবায়ন করতে পারে, তবে তাতে অবশ্যই সঠিক প্রমাণ থাকতে হবে।

১১.৩.৩ শাস্তি: শাস্তির পরিমাণ এবং বৈধতা

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করতে বিচারক কর্তৃপক্ষের পক্ষে মাপকাঠি থাকা জরুরি। বিচারককে বিধান অনুসারে শাস্তি দেওয়ার জন্য পুরো প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হয়।

১১.৪ আধুনিক যুগে ইসলামী শাস্তির বাস্তবায়ন: চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতা

আধুনিক যুগে মুসলিম সমাজে ইসলামী শাস্তির বাস্তবায়ন নানা কারণে সমস্যা সম্মুখীন। বিশ্বব্যাপী সেক্যুলারিজমের প্রভাব, মানবাধিকার সংগঠনগুলোর বিরোধিতা এবং সরকারের নীতি পরিবর্তনের কারণে ইসলামী শাস্তি অনেক দেশে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় না। তবে কিছু দেশ, যেমন সৌদি আরব, ইরান এবং পাকিস্তানে শরিয়াহ আইন নির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা হয়।

১১.৪.১ ইসলামী আইন এবং আন্তর্জাতিক চাপ

বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশই আন্তর্জাতিক চাপের কারণে ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী শাস্তি কার্যকর করতে বাধ্য হচ্ছে না। বহু মানবাধিকার সংস্থা মুসলিম দেশের বিচার ব্যবস্থা ও শাস্তির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে। ফলে এসব দেশে শরিয়াহ আইন প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১১.৪.২ আধুনিক আইনের সাথে ইসলামী শাস্তির সমন্বয়

আধুনিক আইন এবং ইসলামী শরিয়াহ আইনের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশে ইসলামী আইন এবং আন্তর্জাতিক আইন একসাথে চলতে থাকে,

যা অনেক সময় কনফ্লিক্টের সৃষ্টি করে। তবে, ইসলামী দেশে শরিয়াহ আইন অনুসরণ করা একমাত্র সত্যিকারের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পথ হতে পারে।

১১.৫ উপসংহার

ইসলামে হারাম সম্পর্কের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান স্পষ্ট এবং এর প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত শাস্তি মানুষের মাঝে নৈতিকতা এবং সতর্কতা সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত হয়েছে। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা যথাযথ প্রমাণ ও সাক্ষীর ভিত্তিতে শাস্তি নির্ধারণ করে, যাতে কোন নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি না পায়। যদিও আধুনিক যুগে নানা কারণে এসব শাস্তির বাস্তবায়ন কিছুটা কঠিন, তবুও ইসলামী শরিয়াহ-এর মধ্যে একটি পরিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি রয়েছে।

অধ্যায় ১২ : উপসংহার ও সারসংক্ষেপ

এই গবেষণাপত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম সম্পর্কের প্রকৃতি, ধরণ ও পরিণতি নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, হারাম সম্পর্ক শুধু ব্যক্তিগত পাপ নয়, বরং এটি সামাজিক অবক্ষয়ের কারণও বটে। ইসলামে পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের একটি সুনির্দিষ্ট সীমা ও শালীনতা রয়েছে, যা ব্যতীত যেকোনো সম্পর্ক হারাম হিসেবে বিবেচিত হয়।

হারাম সম্পর্কের মধ্যে প্রেম-প্রণয়, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, সমকামিতা, পরনারী/পুরুষে আসক্তি, চ্যাটিং বা মেসেজে অশ্লীলতা, গোপনে সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব সম্পর্ক কুরআনের বহু আয়াতে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু হাদীসে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হারাম সম্পর্ক থেকে সমাজকে বাঁচাতে হলে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়ন, পরিবারে ধর্মীয় অনুশাসন, তরুণ-তরুণীদের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং নৈতিক শিক্ষার প্রচার অপরিহার্য।

গবেষণায় উঠে এসেছে যে, ইসলামী বিধান অনুযায়ী বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া সকল রকমের ঘনিষ্ঠতা হারাম। গবেষণার মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, হারাম সম্পর্ক ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং এটি দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির কারণ হতে পারে। বর্তমান

প্রযুক্তিনির্ভর যুগে হারাম সম্পর্কের বিস্তার দিন দিন বাড়ছে, যা প্রতিরোধে কেবল আইনি পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়; বরং আত্মিক ও নৈতিক জাগরণ সৃষ্টি করাও প্রয়োজন।

এই প্রবন্ধে হারাম সম্পর্ক প্রতিরোধে ইসলামী শিক্ষা, সামাজিক উদ্যোগ এবং পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই থিসিসের মাধ্যমে একটি স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামে হারাম সম্পর্ক কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়, এবং মুসলিমদের উচিত তা থেকে দূরে থাকা ও সমাজকেও রক্ষা করা।

তথ্যসূত্র

- ১.(সুরা আন-নিসা: ১৩) [১]
- ২.(সুরা আন-নিসা: ১৪) [২]
- ৩.(সুরা আল-আ'রাফ: ১৫৭) [৩]
- ৪.(সূরা আল-আহযাব:৩৬) [৪]
- ৫.(জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩৩৩৪) [৫]
- ৬. (সূরা আল মায়িদা : ৮৭) [৬]
- ৭.(সুরা আল-ইসরা: ৩২) [৭]
- ৮.(সহীহ বুখারী:৬২৪৩) [৮]
- ৯. (সূরা আশ-শু’আরাঃ ১৬৫-১৬৬) [৯]
- ১০. সূরা আল-আ’রাফ: ৮০-৮১) [১০]
- ১১.(জামে’ আত-তিরমিজি: ১৪৫৬) [১১]
- ১২.(সূরা আল-মু’মিনূন: ৫-৬) [১২]
- ১৩.(সুরা আল-বাক্বারাহ:২২১) [১৩]
- ১৪.(সুরা আল-মুমতাহিনা:১০) [১৪]
- ১৫.(সূরা আন-নিসা : ২৩) [১৫]
- ১৬.(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫১১৫) [১৬]
- ১৭.(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৩১০) [১৭]
- ১৮.(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৩২১) [১৮]
- ১৯. (সুরা আল-মায়েদাহ: ২) [১৯]
- ২০.(তাফসীরে ইবনে কাছীর)[২০]

- ২১.(তাফসীরে মাআ'রিফুল কুরআন) [২১]
- ২২. (সূরা আল-মু’মিনুন: ৫-৭) [২২]
- ২৩.(সূরা আল-আহযাব:৫৯)[২৩]
- ২৪.(সূরা আন-নূর:৩১)[২৪]
- ২৫. (সহীহ বুখারী: ২৪৭৫) [২৫]
- ২৬.(সুনানে আবু দাউদ হাদিস: ৪৪৬২)[২৬]
- ২৭.(জামে' আত তিরমিযি: ১১৭১)[২৭]
- ২৮.(জামে' আত তিরমিযি: ২১৬৫)[২৮]
- ২৯.(সহীহ বুখারী: ৬২৪৩)[২৯]
- ৩০.(সুনানে ইবনে মাজাহ:৪০১৯)[৩০]
- ৩১.(সুরা আন নুর:৩০)[৩১]
- ৩২.(সহীহ বুখার: ৫০৬৬)[৩২]
- ৩৩.(সূরা তাহরীম: ৬)[৩৩]
- ৩৪.(সুনানে ইবনে মাজাহ:৪০১৯)[৩৪]
- ৩৫.(সূরা আন-নূর: ২)[৩৫]
- ৩৬.(সহিহ মুসলিম:৪৩১০)[৩৬]
- ৩৭.(সুরা হুদ: ৮২)[৩৭]
- ৩৮.(মুসনাদ আহমদ ২৯১৫)[৩৮]
- ৩৯.(তিরমিজি: ৪/৫৭; আবু দাউদ: ৪/২৬৯; ইবনে মাজা: ২/৮৫৬)[৩৯]